সম্পূর্ণ উপন্যাস

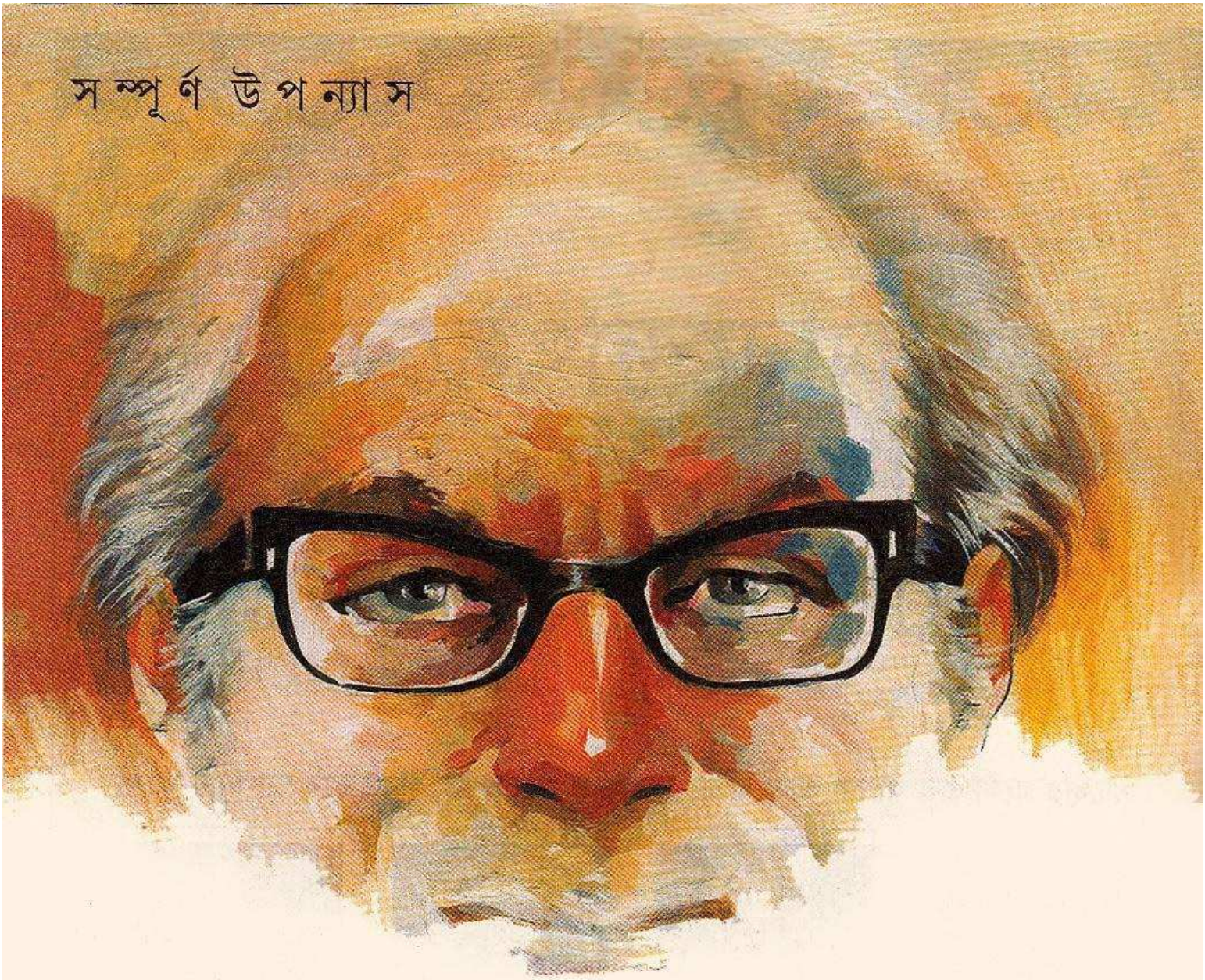

মার্কুইস স্ট্রিটে মৃত্যুফাঁদ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এবার গরমের ছুটিতে মিতিনমাসির বাড়িতে বেড়াতে এসে ভারী ফাঁপরে পড়েছে টুপুর। ভেবেছিল শুয়ে-বসে-গড়িয়ে বেশ কেটে যাবে দিনগুলো। আয়েশ করে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, চলবে অফুরন্ত গল্প-আড্ডা, শখ করে নিত্যনতুন পদ রাঁধবে মিতিনমাসি, মাঝেমধ্যে হোটেল-রেস্তরাঁয় ভূরিভোজ খাওয়াতে নিয়ে যাবে পার্থমেসো। আর যদি কোনও কেস-টেস এসে গেল তো সোনায়

সোহাগা। উত্তেজনার আঁচে সেঁকে নিতে পারবে নিজেকে। কিন্তু কোথায় কী? মিতিনমাসির হাত এখন বেবাক ফাঁকা এবং এক আজব ভূত চেপেছে মাথায়। টুপুর নাকি বেজায় প্যাংলা হয়ে যাচ্ছে, তার শরীরস্বাস্থ্য মজবুত করা নাকি বেজায় জরুরি। ব্যস, ভাবামাত্র কাজ। তৈরি হয়ে গেল টুপুরের ডেলি রুটিন। আর তারই জের সামলাতে বেচারা টুপুরের রীতিমত নাজেহাল দশা।

কী যে সব ফতোয়া জারি করেছে মিতিনমাসি! কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটায় শয্যাত্যাগ, আদা-গুড় ভেজানো ছোলা সহযোগে খানিক কাঠবাদাম ভক্ষণ, তারপর বেরিয়ে পড়ো মাসির সঙ্গে প্রভাতী ভ্রমণে। নামেই ভ্রমণ, আসলে হাড়ভাঙা খাটুনি। পেল্লাই রবীন্দ্র সরোবরটিকে হনহনিয়ে দু'বার পাক মারা, তারপর হরেকরকম শারীরিক কসরত...। বাড়ি ফিরে দুধ-কর্নফ্লেক্স, ডিমসেদ্ধ, কলা। দু' ঘণ্টা পরে ফলের রস। দুপুরে প্রচুর শাকসবজি, কম তেলমশলার মাছ, সঙ্গে এক বাটি টক দই। বিকেল চারটেয় এক ঘণ্টা যোগাসন। ফের ফল-দুধ। লুচি-পরোটা-চপ-কাটলেট একেবারে বন্ধ। তার বদলে স্টু-সুপ কিংবা ইডলি-ফিডলি গোছের কিছু। নৈশাহারেও প্রায় একই ধরনের অখাদ্য। তাতেও মুক্তি নেই, খাওয়ার পর ফ্ল্যাট-বাড়ির ছাদে গিয়ে হাঁটতে হচ্ছে আধঘণ্টা। বুমবুম তো খাবার দেখলেই ওয়াক তুলছে। একমাত্র পার্থমেসোরই কোনও হেলদোল নেই। প্রেসে গিয়ে মোগলাই খানা সাঁটাচ্ছে দেদার, শুধু বাড়িতে ভালমানুষটি সেজে থাকছে। এমন একটা গরমের ছুটি এ বাড়িতে কখনও কাটেনি টুপুরের। সাত দিনেই মনটা পালাই-পালাই করছে।

আজও সকালটা একই ভাবে শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্র সরোবরে চক্কর কেটে, ব্যায়াম-ট্যায়াম করতে-করতে জিভ প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। গাছে-গাছে কোকিল ডাকছে, ফুরফুরে হাওয়াও দিচ্ছে, কিন্তু টুপুর যেন কিচ্ছু টের পাচ্ছিল না। খানিক তফাতে লাফিং ক্লাবের এক দল সদস্য বিকট কায়দায় হাসির অনুশীলন চালাচ্ছে, সেদিকেও তাকানোর অবকাশ নেই। ঘামে ভিজে জ্যাবজ্যাবে হয়ে গেছে তার ট্র্যাকসুট, তবু মাসির নির্দেশ মতো হাত-পা ছুড়ছে এক মনে।

BanglaeBookDownload.Com

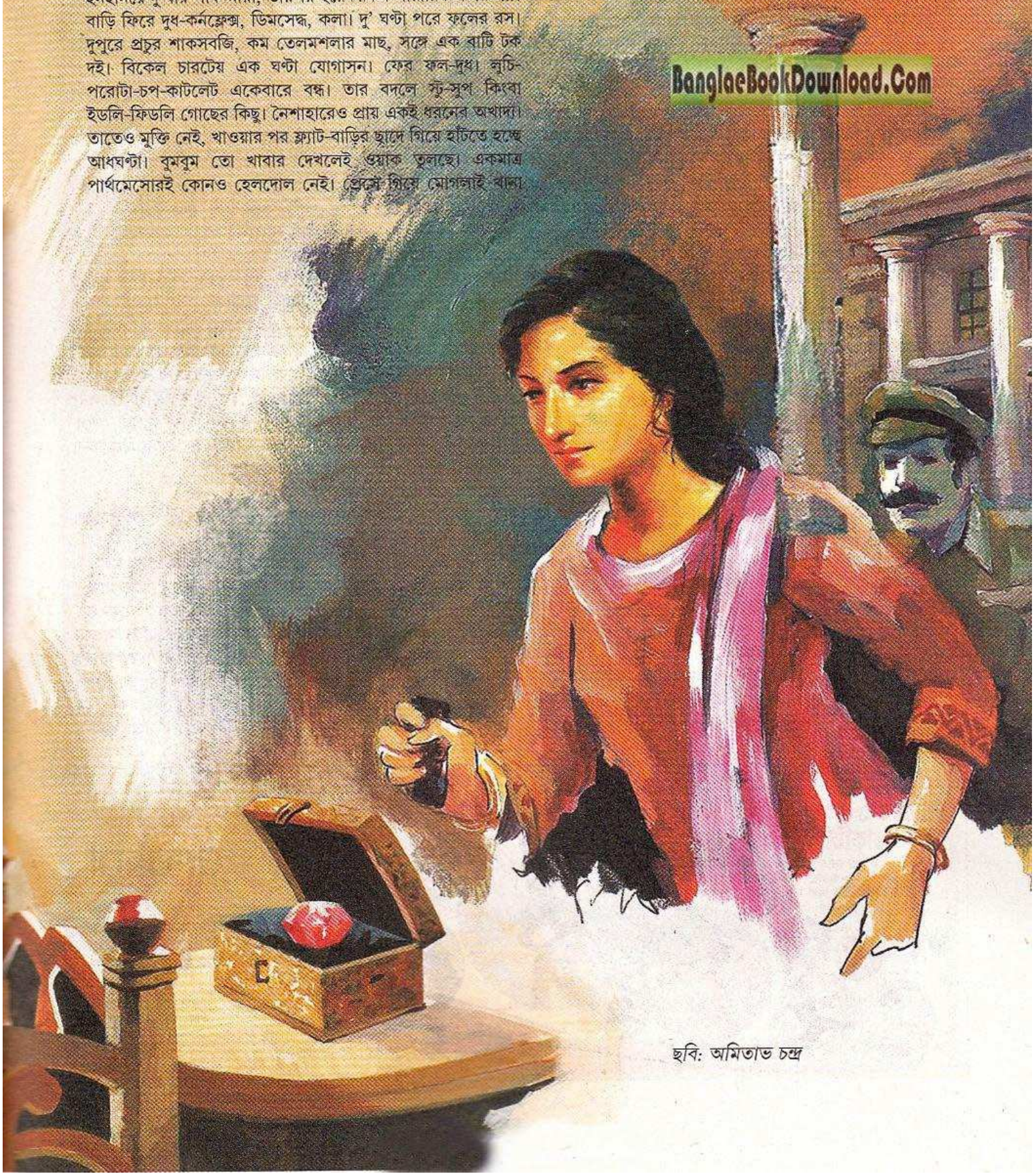

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

হঠাৎই শরীরচর্চায় বিঘ্ন ঘটল। বড়-বড় পা ফেলে কে উনি আসছেন এদিকে? অনিশ্চয় আংকল না?

হ্যাঁ, জাঁদরেল পুলিশ অফিসার অনিশ্চয় মজুমদারই বটে। একেবারে সামনে এসে একগাল হাসলেন অনিশ্চয়, "জানতাম ম্যাডামকে এখানেই পাব।"

মিতিন ধনুকের মতো বাঁকাচ্ছিল দেহটাকে। সিধে হয়ে বলল, "সুপ্রভাত। আপনি হঠাৎ লেকে যে বড়? মর্নিংওয়াক ছেড়ে দিয়েছিলেন না?"

"আবার ধরেছি। মধ্যপ্রদেশটা যে হারে বেড়ে চলেছে...!"

"তো? ওই মধ্যপ্রদেশই তো আপনাদের শোভা দাদা। ভুঁড়ির সাইজ দিয়েই তো আপনাদের কর্মদক্ষতা মাপা হয়।"

অনিশ্চয় সন্দিগ্ধ চোখে বললেন, "ঠাট্টা করছেন না তো?"

"ছি ছি, তাই কখনও করতে পারি?" মিতিন মজা করার সুরে বলল, "তো এখন রোজই আসছেন নিশ্চয়ই?"

"এভরি সানডে। কোনও রোববারই বাদ দিই না।"

"গুড। ভেরি গুড। ওয়েস্টলাইনের উন্নতি কিছু হল?"

"পাক্কা তিন মিলিমিটার কমেছে। খুব একটা মন্দ নয়, কী বলেন?" নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা হেসে উঠলেন অনিশ্চয়। হাসিমুখে তাকালেন টুপুরের দিকে, "কী গো মিস ওয়াটসন, তোমার কী সমাচার? এক্সারসাইজ করে কতখানি তাগদ বাড়ল? পারবে মাসির সঙ্গে কুস্তি লড়তে?"

জবাব দিল না টুপুর। লাজুক-লাজুক মুখে হাসল একটু।

অনিশ্চয় ফের ফিরেছেন মিতিনে, "তা আপনার প্রফেশনের হালচাল কেমন? জালে এখন ক'খানা ক্লায়েন্ট?"

"একটিও না। কলকাতার লোকজন খুব ভাল হয়ে গিয়েছে। ক্রাইম করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অগত্যা সারাদিন মাছি তাড়াচ্ছি।"

"অর্থাৎ সুখেই আছেন। এদিকে আমরা পুলিশরা তো চুরিডাকাতি, খুনখারাপি সামলাতে-সামলাতে জেরবার হয়ে যাচ্ছি," বলেই কয়েক সেকেন্ড চুপ। কী যেন ভাবছেন অনিশ্চয়। বললেন, "আপনার হাত তা হলে এখন শূন্য?"

"বিলকুল।"

"একটা কেস আপনাকে দিতে পারি, বুঝলেন। একেবারেই ফাঁপা। তবে আপনাকে চালান করলে আমার মাথা একটু হালকা হয়।"

"কী রকম? কী রকম?"

"এক পাগলা বুড়ো আমায় বহুত বোর করছেন। তাঁর ফোনের ঠেলায় আমি জেরবার। অথচ ভদ্রলোকের সমস্যায় পুলিশের কিছুই করার নেই। সত্যি বলতে কী, আদৌ কোনও সমস্যা আছে বলে আমার মনেও হয় না। তা আপনি তো পেশাদার গোয়েন্দা, দেখুন যদি ওঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আশ্বস্ত করতে পারেন।"

"অর্থাৎ আমাকে কাউন্সেলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে?"

"অনেকটা সেই রকমই। তবে ওঁর কথাবার্তা থেকে যদি কোনও রহস্য খুঁজে বার করতে পারেন, সেটা আপনার বাড়তি লাভ।"

"কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?"

"মার্কুইস স্ট্রিটে। নাম ডেভিড যোশুয়া।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোন, "ইহুদি নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন তো। কলকাতায় এখন ইহুদিরা ডোডো পাখির মতো দুর্লভ। ইনি সেই বিরল প্রজাতিরই একজন।"

"হুঁ, এ শহরে এখন ইহুদির সংখ্যা সাকুল্যে একশো হবে কিনা সন্দেহ," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "তা প্রবলেমটা কী ভদ্রলোকের?"

"কিছুই না। আবার অনেক কিছু। ওঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, কেউ সারাক্ষণ ওঁর উপর নজর রাখছে। সে মিস্টার যোশুয়া আর তাঁর স্ত্রীকে না মেরে ছাড়বে না। মাঝে-মাঝেই নাকি তাঁর কাছে ঘোস্ট কল আসে। কে নাকি তাঁকে শাসায়। অথচ ওই নম্বরে মিস্টার যোশুয়া কল করে দেখেছেন, নম্বরটাই নাকি নেই।"

"যে ভয় দেখাচ্ছে, সে কেন মারবে তা কি বলেছেন মিস্টার যোশুয়া?"

"তিনি তো এক-এক সময়ে এক-এক কথা বলেন। কখনও বলেন আমার বাড়িটাকে গ্রাস করতে চায়। কখনও বলেন, আমার গোটা বংশটাকেই নিকেশ করে দেবে। আমার তো মনে হয়, সব কিছুই ওঁর মনগড়া ধারণা। যদিও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি, তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জেনেছি উনি এমন কিছু অর্থবান ব্যক্তি নন যে, ওঁকে হত্যা করে কারও কোটি-কোটি টাকা নাফা হবে।"

"তবু উনি যখন ভয় পাচ্ছেন, পুলিশের তরফ থেকে তো ওঁকে একটা প্রোটেকশন দেওয়া উচিত।"

"তুৎ, কী প্রোটেকশন দেব? যে কেউ ওরকম বললেই কি বাড়ির দরজায় চারজন করে পুলিশ দাঁড় করিয়ে রাখা যায়? পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কি খেয়েদেয়ে আর কোনও কাজ নেই?" অনিশ্চয় মুখ বাঁকালেন, "বরং এই সব ঝুটঝামেলা আপনারা সামলাতে পারবেন।"

মিতিন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ভদ্রলোক করেন কী?"

"একসময়ে গ্রেট ইন্ডিয়া হোটেলের চিফ অ্যাকাউট্যান্ট ছিলেন। পোদ্দার কোর্টের কাছে আরও দু'খানা বাড়িও ছিল। সেখান থেকে কিছু ভাড়া-টাড়াও পেতেন। সেই বাড়ি দু'টো এখন বেচে দিয়েছেন। ব্যাঙ্কে জমানো টাকার সুদ থেকে সংসার চলে।"

"কে-কে আছেন সংসারে?"

"এখন তো শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই থাকেন। একটিমাত্র ছেলে, সে বিদেশে সেটলড।"

"ও। তা এই ভদ্রলোকের মৃত্যুভয় কবে থেকে শুরু হয়েছে?"

"এগজাক্টলি বলতে পারব না। তবে মনে হয় দু'-তিন মাস," অনিশ্চয় একটু থেমে থেকে বললেন, "অবশ্য ভয় পাওয়ার বোধ হয় একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। মিস্টার যোশুয়া আর তাঁর স্ত্রী লন্ডনে ছেলের কাছে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ফিরেছেন বছর খানেক আগে। তিনি ফেরার পরপরই তাঁর ভগ্নিপতি মারা যান, তার মাস কয়েক পরে দিদি। দু'টোই প্লেন ডেথ। হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু কেন যেন মিস্টার যোশুয়ার ধারণা হয়েছে, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবে মারা যাননি।

আর সেই ধারণা থেকেই মৃত্যুভয়ের সূত্রপাত। আপনিই বলুন ম্যাডাম, কেউ যদি এরকম অযথা ভয় পেতে শুরু করে পুলিশ কী করবে?"

"তা বটে। মিতিনকে একটু যেন চিন্তান্বিত দেখাল। কপাল কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে, ভদ্রলোকের ফোন নম্বরটা আমায় দিন, আমি যোগাযোগ করে নেব। তার আগে আপনি মিস্টার যোশুয়াকে আমার কথাটা জানিয়ে রাখুন।"

"শিয়োর। আমি আজই বলে দিচ্ছি।"

মোবাইল থেকে মিস্টার যোশুয়ার নম্বরটা বার করে মিতিনকে দিলেন অনিশ্চয়। তিনি চলে যাওয়ার পর টুপুর বলল, "কেসটা তুমি নিয়ে নিলে?"

"হাতে তো এখন তেমন কাজকর্ম নেই। দেখি না ব্যাপারটা একটু নাড়াচাড়া করে।"

"কী দেখবে? মানে এগজাক্টলি তুমি কী করবে?"

"জানি না। আগে মিস্টার যোশুয়ার সঙ্গে মোলাকাত তো হোক, তারপর তো বোঝা যাবে।"

বাড়ি ফিরে পার্থকে বলামাত্র সে রীতিমত উত্তেজিত। চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল, "কী নাম বললে? ডেভিড যোশুয়া? ইনি কি এলিস যোশুয়ার কোনও রিলেটিভ?"

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কে এলিস যোশুয়া?"

"কিছুই জানো না দেখি। জেনারেল নলেজটা একটু বাড়াও," পার্থ পায়ের উপর পা তুলে নাচাচ্ছে, "সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়ে জাপানিরা যখন দক্ষিণ এশিয়ায় বম্বিং শুরু করে, তখন বার্মা মানে এখন যাকে বলে মায়ানমার, সেখান থেকে অনেক ইহুদি পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। এলিস যোশুয়া ছিলেন তাঁদেরই একজন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে গ্র্যান্ড হোটেলে চাকরি নিয়েছিলেন। তবে জানোই তো ব্যবসা করাটা ইহুদিদের রক্তেই আছে। তাই কিছুদিন পরে চাকরি-বাকরি ছেড়ে পার্ক স্ট্রিটে তিনি একটা ঘ্যামচ্যাক রেস্তরাঁ খুলে বসেন। কোন রেস্তরাঁ জানো? ট্রিংকাস।"

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "ওমা, সে তো এখনও চলছে।"

"তবে এখন বোধ হয় অন্য কেউ কিনে নিয়েছে," পার্থ গলা ঝাড়ল। তারপর বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভঙ্গিতে মিতিনকে বলল, "যাক গে, গোড়াতেই তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া ভাল। টাকাপয়সার ব্যাপারে ইহুদিরা কিন্তু খুব হিসেবি। ভয়ংকর চিপ্পুস। ওরা নগদানগদি ছাড়া লেনদেন করে না। আশীর্বাদ পর্যন্ত ধারে দেয় না। সুতরাং কেস হাতে নিলেই টাকাপয়সার ব্যাপারটা ফয়সালা করে নেবে।"

মিতিন হেসে বলল, "আহা, দেখি আগে কেসটার কোনও সারবত্তা আছে কিনা?"

"ওই দেখতে যাওয়ার জন্যও ফি চার্জ করবে।"

"সে হবেখ'ন। এখন বলো আজ ব্রেকফাস্টে কী খাবে?"

"নতুন একটা কেস পাচ্ছ, সেই অনারে একটু মুখবদল হোক।"

"উত্তম প্রস্তাব। সেদ্ধ ডিমের বদলে আজ তা হলে পোচ হতে পারে।"

"কেন, একদিন লুচি তরকারি খেলে কী হয়? রবিবারের সকালে টোস্ট-ফোস্ট পোষায়?"

"বেশ। আজ না হয় রুটিন ব্রেক।"

বুমবুম 'ইয়ায়া' করে উল্লাস দেখিয়ে উঠল। পার্থ আহ্লাদে আটখানা। মুচকি হেসে অন্দরে চলে গেল মিতিন।

টুপুরের মনে হল একটা কাজের খোঁজ পেয়ে মিতিনমাসিও বেশ পুলকিত। কিন্তু কাজটা যে ঠিক কী? কোনও রহস্য আছে কি আদৌ?

॥ ২ ॥

প্রথম দর্শনে বাড়িখানা হতাশই করল টুপুরকে। জাদুঘরের পিছন দিকের এই রাস্তাটায়, শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে, এত জীর্ণ এক অট্টালিকা এখনও যে টিকে আছে টুপুর ভাবতেই পারে না। সত্যি বলতে কী, পেল্লায় উঁচু পাঁচিলটার অন্দরে আদৌ ঘরবাড়ি আছে কিনা তাই তো ঠাহর করা মুশকিল। ভাগ্যিস ভাঙাচোরা গেটের ধারের থামটায় পাথরের ফলকের উপর বড়-বড় হরফে বাড়ির নম্বর লেখা। নইলে বোধ হয় ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হত।

গাড়িটাকে ফটকের দিকে ঘুরিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল মিতিন। তারপর ঘড়ি দেখে বলল, "সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। এখন সবে পাঁচটা দশ।"

পাশেই পার্থ। আজ রবিবার বলে সেও যোগ দিয়েছে অভিযানে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সো হোয়াট? চলো, ঢুকে পড়ি।"

খোলা ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি থেকে নামল টুপুররা। এদিক-ওদিক চোখ চালিয়ে টুপুর আরও নিরাশ। মূল বাড়িখানা ঘিরে জমি আছে অনেকটা। কিন্তু সেখানে ফুল নেই, বাগান নেই, শুধু ঝোপঝাড় আর আগাছা। বোঝাই যায় মোটেই রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। বাড়িটারই বা কী ছিরি! আকারে যথেষ্ট ঢাউস এবং দোতলা। গায়ে চেকনাই তো দূরস্থান, পলস্তারা পর্যন্ত খসে-খসে পড়ছে। এমন একটা ভগ্নস্তূপে এসে আজকের বিকেলটাই বরবাদ হল না তো?

অদূরে এক গাড়িবারান্দার মতো জায়গা। সম্ভবত গাড়ির আওয়াজ পেয়ে এক দীর্ঘাকৃতি প্রবীণ আবির্ভূত হয়েছেন সেখানে। মুখমণ্ডলে ধবধবে সাদা দাড়ি, পরনে ঢলঢলে পাজামা আর এই গরমেও লম্বা ঝুলের কোট। মাথায় ফেজটুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সব মিলিয়ে যেন কেমন-কেমন। সময়ের সঙ্গে যেন নিতান্ত বেমানান।

হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। বিচিত্র বাংলা উচ্চারণে বললেন, "আমিই ডেভিড যোশুয়া। অধীনের গৃহে পদধূলি দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।"

মিতিন হাতজোড় করে নমস্কার করল। পার্থ আর টুপুরের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল মিস্টার যোশুয়ার। গাড়িবারান্দার লাগোয়া তিন ধাপ লাল সিঁড়ি। গৃহকর্তার সাদর আহ্বানে সিঁড়ি পেরিয়ে ড্রয়িংহলে এল টুপুররা।

বিশাল হলঘরখানায় পা রেখে টুপুরের চক্ষুস্থির। বাইরের হতশ্রী দশার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। দেওয়াল খানিক রংজ্বলা বটে, তবে আসবাবপত্র ঝকঝক করছে। কাঠের সাবেকি প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সোফাসেট, পাথর বসানো সেন্টারটেবিল, পুরনো কিন্তু পরিচ্ছন্ন কার্পেট, সিলিং থেকে ঝুলছে কাচের বাতিদান, কারুকাজ করা স্ট্যান্ডল্যাম্প, প্রাচীনতার গন্ধ মাখা শোকেস, লম্বা-লম্বা জানলায় ভারী-ভারী পরদা...। এক পাশে একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালে খান চারেক অয়েল পেন্টিং। সব ক'টা ছবিতেই দাড়িওয়ালা টুপিধারী পুরুষ। তাঁদের পরনেও মিস্টার যোশুয়ার ছাঁদেরই পোশাকআশাক। বেশ টের পাওয়া যায়, ঘরের আবহাওয়া একটু অন্যরকম। সময় যেন বহু বছর ধরে থমকে আছে এখানে।

টুপুরদের বসতে বলে ডেভিড জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তো গরমের দিন, প্রথমে একটু শরবত নেবেন কি?"

মিতিন বিনয়ের সুরে বলল, "যদি আপনার অসুবিধে না হয়...।"

"কী বলছেন ম্যাডাম? অতিথিদের আপ্যায়ন করা তো ইহুদিদের ধর্ম," স্মিত মুখ ডেভিডের স্বর সামান্য উচ্চগ্রামে উঠল, "যতীন, একবার শুনে যাও তো।"

বাক্য ফুরনোর আগেই বছর তিরিশের যতীন উঁকি দিয়েছে দরজায়। চেহারা একেবারেই কাজের লোকের মতো নয়, বরং দেখে বাড়ির একজনই মনে হয়। পরনে তার জিন্‌স-টিশার্ট, হাতে ঘড়ি, চুল বেশ কায়দা করে ছাঁটা।

মনিবের নির্দেশ নিয়ে সে চলে যেতেই মিতিন জিজ্ঞেস করল, "ছেলেটি বাঙালি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। আমার এক বাঙালি বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছেন। ভাল ছেলে। আমাদের এই বুড়োবুড়ির দেখভাল করে।"

পার্থ অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলার জন্য উসখুস করছিল। ফস করে বলে উঠল, "যদি কিছু মনে না করেন... মিস্টার এলিস যোশুয়া কি আপনাদের কেউ হন? মানে যিনি ট্রিংকাসের মালিক ছিলেন?"

"পদবি যখন যোশুয়া, আত্মীয় তো বটেই," কাঠের দোলচেয়ারে

বসলেন ডেভিড। হেলান দিয়ে বললেন, "এলিস ছিলেন আমার দূরসম্পর্কের কাকা। এলিসের ঠাকুরদা ছিলেন আমার বাবার ঠাকুরদার ফার্স্ট কাজিন। আমরা সিরিয়া থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলাম। ওর পূর্বপুরুষ গিয়েছিলেন রেঙ্গুন। ওরা কলকাতায় আসার পর আমার বাবাই তো এলিসকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই ১৯৪৪ সালে। তখন আমি খুবই ছোট। বছর দশেক।"

"আপনার তো তা হলে অনেক বয়স?"

"সেভেনটি এইট চলছে।"

"দেখে কিন্তু বোঝা যায় না। মনে হয় বড় জোর সত্তর-টত্তর..."

শুনে ভারী খুশি হয়েছেন ডেভিড। দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, "নিয়ম কানুন মেনে চলি, শরীরের যত্ন নিই, তাই অসুখবিসুখ বড় একটা কাছে ঘেঁষে না।"

"আপনারা তো বাগদাদি ইহুদি, তাই না?"

"কলকাতায় প্রায় সব ইহুদিই তো বাগদাদি। অল্প কয়েক ঘর বেনে ইজরাইলিও ছিল। তবে এখন তারা প্রায় সকলেই ভারত থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। একমাত্র টিকে আছেন জ্যাকব পরিবার। তাঁরাও তো শুনলাম আমাদের পবিত্র ভূমিতে চলে যাচ্ছেন।"

"মানে ইজরায়েলে?"

মৃদু ঘাড় নাড়লেন ডেভিড। একটু উদাস স্বরে বললেন, "কলকাতায় আমরা এখন ইহুদিরা আছি উনচল্লিশ জন। সংখ্যাটা এবার ছত্রিশে নেমে যাবে।"

ঘরের পরিবেশ একটু যেন ভারী হয়ে যাচ্ছিল, কথা ঘোরানোর জন্যই মিতিন সরব হয়েছে, "মিস্টার যোশুয়া, আমরা কি এবার আপনার সমস্যাটার ব্যাপারে একটু আলোচনা করতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটানো তো ঠিক নয়।"

ডেভিড সোজা হয়ে বসলেন, "আপনাকে নিশ্চয়ই মিস্টার অনিশ্চয় মজুমদার খানিকটা বলেছেন?"

"আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বিশদে।"

একটুক্ষণ চিন্তা করলেন ডেভিড। তারপর দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বড় বিপন্ন বোধ করছি।"

"কেন?"

"গত সাত-আট মাসের মধ্যে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল...।"

"যেমন?"

"প্রথমে আমার দিদির হাজব্যান্ডের মৃত্যু।"

"কী হয়েছিল তাঁর?"

"আমাদের ডাক্তার তো বলল হার্ট অ্যাটাক। যদিও তাঁর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি, কিন্তু আব্রাহামের শরীর-স্বাস্থ্য ছিল আমার চেয়েও মজবুত। নো প্রেশার, নো শুগার, নাথিং।"

"এরকম তো হয় মিস্টার যোশুয়া। কোনও সিম্পটম নেই, অথচ দুম করে করোনারি অ্যাটাক হয়ে গেল।"

"সে আমি জানি ম্যাডাম। কিন্তু আব্রাহামের মৃত্যুটা...। সেদিন এ বাড়িতে একটা পরব চলছিল। প্রার্থনার পর খানিকক্ষণ গানবাজনাও হল। আমাদের ইহুদি সমাজের বাইরেরও অনেকে সেদিন এসেছিলেন। আব্রাহাম তাঁদের সঙ্গে কত হাসিগল্প করলেন। আমাদের ডাক্তারের বাঁশি বাজানো শুনে দারুণ তারিফ করলেন। অথচ সেই মানুষটাই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে ধড়ফড়িয়ে শেষ।"

"হার্ট অ্যাটাকের কেসে এমনও তো হরবখতই ঘটে মিস্টার যোশুয়া। আপনার জামাইবাবুর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। হয়তো ওঁর শরীর সেদিনকার আমোদ-আহ্লাদের ধকল নিতে পারেনি...।"

"ডাক্তারেরও একই অভিমত। আমি কিন্তু মানতে পারিনি। তখনই মনে হয়েছিল মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।"

"সঙ্গে-সঙ্গে জানাননি কেন?"

"পুলিশকে তো জানিয়েছিলাম। পোস্টমর্টেমও হয়েছিল।"

টুপুর জোর চমকেছে। অনিশ্চয় আংকল এ তথ্যটা তো দেননি!

মিতিনেরও চোখে বিস্ময়, "তাই নাকি? তা পোস্টমর্টেমে কী পাওয়া গেল?"

"কিছুই না। সেই ডাক্তারও বললেন, হার্ট বন্ধ হয়েই...।"

"হুম।" মিতিনের কপালে পলকা ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল, "এর পর আপনার দিদির মৃত্যু?"

"ইয়েস। দিদি মারা গেলেন আর একটা পরবের দিন। সেদিন তো অনুষ্ঠান চলাকালীনই ক্যাথলিন হঠাৎ...। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এ ঘরে সবে ঢুকেছে, অমনি কেমন যেন একটা আওয়াজ করে উঠল, তারপরই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেদিনও ডাক্তার বাড়িতে মজুত। আমাদের অনুষ্ঠানেই ছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পরীক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু তখন আর ক্যাথলিন বেঁচে নেই। এমনই কপাল, চিকিৎসা করানোর সুযোগটা পর্যন্ত মিলল না।"

"এই মৃত্যুটাও আনন্যাচারাল মনে হয়েছে আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"এবারও পোস্টমর্টেম করিয়েছিলেন?"

"তুলেছিলাম কথাটা। তবে উপস্থিত সবাই আমাকে ধমকে-ধামকে থামিয়ে দিল। আমারও মনে হল এবারও যদি কাটাছেঁড়া করে কিছু না পাওয়া যায়...," ক্ষণকাল নীরব থেকে ডেভিড ফের বললেন, "আচ্ছা ম্যাডাম, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই দু'টো উৎসবের রাতে প্রাণ হারালেন, এর মধ্যে কি আপনি কোনই যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না?"

"আপনি কি পেয়েছেন?"

"কিছু তো পেয়েছি। নইলে আর ছটফট করছি কেন? ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে আপনিও হয়তো...।"

"কী রকম?"

"তা হলে আর একটু ডিটেলে বলি। আমার দিদির হাজব্যান্ড আব্রাহাম মাটুক, যাঁর পুরো নাম আব্রাহাম এলিজা এদিকিয়েল মাটুক, ছিলেন এক বিখ্যাত ইহুদি ব্যবসায়ী পরিবারের বংশধর। এক কালে চিনদেশে আফিম পাঠানোর কারবার ছিল তাঁদের। নিজস্ব জাহাজও ছিল। পরে আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ হওয়ার পর ওঁরা কাপড়ের কারবার শুরু করেন। এখন সব বেচেবুচে দিয়েছিলেন, তবে আব্রাহামের টাকাপয়সা কম ছিল না। যেহেতু আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের কোনও ছেলেপুলে নেই, আব্রাহামের মৃত্যুতে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি চলে আসে আমার দিদির নামে এবং দিদি মারা যাওয়ার পর আমিই এখন ওঁদের ধনসম্পদের মালিক। এই ব্যাপারটা আমার কেমন গোলমেলে ঠেকছে।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "সে কী? কেন?"

"কারণ ক্যাথলিন আগে মারা গেলে আব্রাহামের কানাকড়িও আমার নামে আসত না। আইন অনুযায়ী আব্রাহামের ভাইপোরা পেত সব কিছু।"

"আব্রাহামরা ক' ভাই?"

"তিন। দু' ভাই অনেককাল আগে অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছিলেন। এখন ভাইপোরা সব সিডনির পাকাপাকি বাসিন্দা।"

"তারা এ দেশে আসে না?"

"একেবারেই না। তাদের এই শহরের উপর কোনও টানই নেই। যদিও এখানেই তারা স্কুলজীবনটা কাটিয়েছে। পার্ক স্ট্রিটের ইহুদি স্কুল থেকে তারা পাশ-টাশ করেছিল।"

"উম," পার্থ বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল, "তা হলে তো একটা কথা বলতেই হচ্ছে মিস্টার যোশুয়া। যদি ওই দু'টো মৃত্যুতে সত্যিই কোনও গড়বড় থাকে...!

"আছে। আমি নিশ্চিত।"

"তা হলে সাসপেক্টের তালিকায় প্রথম নামটা কার হবে জানেন তো? আপনার।" পার্থ ডেভিডের দিকে আঙুল দেখাল, "কারণ, মৃত্যুর ক্রম অনুসারে আপনিই একমাত্র লাভবান ব্যক্তি।"

"জানি তো। সত্যি বলতে কি, আব্রাহামের ভাইপোরা তো আমার উপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। আভাসে ইঙ্গিতে সে কথা জানিয়েওছে ফোনে," একটু যেন নিষ্প্রভ শোনাল ডেভিডের গলা, "তবে এতে আমি

দোষের কিছু দেখি না। আব্রাহামের পর ক্যাথলিন মারা যাওয়াতে লাভ তো আমার হয়েছেই। বিপুল লাভ। টাকাপয়সার কথা বাদই দিন, এই বাড়িখানা, চারপাশের জমি সবই তো ছিল আব্রাহামের। ভাগ্যের খেলায় সবই এখন আমার।"

পার্থ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "বলেন কী? তা হলে আপনার নিজের বাড়িটা কোথায়?"

"ছিল। এজরা স্ট্রিটে। একটা অংশে থাকতাম, বাকিটুকু দোকান-টোকানকে ভাড়া দেওয়া ছিল। তিন বছর আগে বেচে দিয়ে উঠে এসেছিলাম এ বাড়িতে আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের জোরাজুরিতে। বুড়ো বয়সে একসঙ্গে থাকলে দিনগুলো খানিক আনন্দে কাটবে, এরকমই ভেবেছিলাম আমরা। জিহোভা সেই সুখটাও বেশিদিনের জন্য দিলেন না। এখন মনে হয় আমরা যদি এ বাড়িতে না আসতাম, তা হলে হয়তো...।"

কথা শেষ হল না, শরবতের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে যতীন। সঙ্গে এক বয়স্কা মহিলা, তাঁর হাতে আর একখানি ট্রে। তাতে কাজু কিশমিশ খেজুর সাজানো। ট্রে দু'খানা টেবিলে নামিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মহিলা। ইংরেজিতে বললেন, "আমি র‍্যাচেল যোশুয়া। ডেভিডের স্ত্রী।"

॥ ৩ ॥

ভদ্রমহিলার চেহারাটি দেখার মতো। বয়স হয়ে গিয়েছে, তবু এখনও কী টকটকে রং। নাক-চোখ-মুখও বেশ কাটা-কাটা। বোঝাই যায় একসময়ে দারুণ সুন্দরী ছিলেন। লম্বাও আছেন বেশ, তবে বয়সের ভারে সামান্য কুঁজো যেন। পরনে ঘিয়ে রঙের ঢলঢলে পাজামা, ফুলহাতা লম্বা ঝুল মেরুন কুর্তা। মাথায় কাপড়ের ফেট্টি।

টুপুরদের উলটো দিকের সোফায় বসে র‍্যাচেল বললেন, "ডেভিড আপনাদের মাথা ধরিয়ে দিয়েছে তো? সেই একই প্রসঙ্গ কচলাচ্ছে নিশ্চয়ই?"

মিতিন বলল, "না না, আমি ওঁর কাছে আপনাদের ফ্যামিলির গল্প শুনছিলাম।"

"তার সঙ্গে এটা এখনও বলেনি, যোশুয়া পরিবার এবার কলকাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে?"

"ঠাট্টা কোরো না র‍্যাচেল।" ডেভিড রীতিমত আহত হয়েছেন। গোমড়া গলায় বললেন, "কেন মানতে চাইছ না, আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের মৃত্যুটা এমনি-এমনি হয়নি? মাটুকরা খতম হয়েছে, এবার যোশুয়াদের পালা। এবার নিশ্চয়ই আমাকে মরতে হবে।"

"ফের ওই কথা?"

"একশোবার বলব। হাজারবার বলব। আমি মৃত্যুর সিগনাল পাচ্ছি।"

"কে পাঠাচ্ছে? তোমার সেই ভুতুড়ে ফোনটা?"

"অবশ্যই। আমাকে তিন-তিনবার জানিয়েছে, এ বাড়িতে ফের মৃত্যু হানা দিচ্ছে।"

"আর কলটা এমন একটা নম্বর থেকে আসছে, যা একেবারেই ভুয়ো। তোমায় টেলিফোন কোম্পানি পর্যন্ত বলছে ওই নম্বরটাই নেই।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," মিতিন এবার দু' হাত তুলে থামিয়েছে র‍্যাচেলকে, "ওই টেলিফোনের কেসটা একটু বুঝে নিতে দিন। সত্যিই কি আপনি থ্রেটনিং কল পেয়েছেন মিস্টার যোশুয়া?"

"বললাম তো, একবার নয়, তিন-তিনবার। দু'বার পুরুষের গলায়, একবার মহিলার গলায়।"

"আপনার মোবাইলে?"

"না। ল্যান্ডলাইনে। আমি মোবাইল ব্যবহার করি না।"

"ও হ্যাঁ। মিস্টার মজুমদার তো আপনার ল্যান্ডলাইন নম্বরটাই আমায় দিয়েছেন," মিতিন অপ্রস্তুত মুখে হাসল, "তা হলে নিশ্চয়ই আপনার ল্যান্ডলাইনে কলার আইডি আছে?"

"না হলে আর নম্বরগুলো পাচ্ছি কোত্থেকে? কিন্তু কল ব্যাক করলে প্রত্যেকবার একই জবাব। দিস নাম্বার ডাজ নট এগ্‌জিস্ট।"

"তিনটে ফোন নিশ্চয়ই তিনটে আলাদা নম্বর থেকে এসেছে?"

"ঠিক তাই।"

"ফোনে এগজাক্টলি কী বলছে?"

"ডেথ ইজ কামিং। বিওয়্যার ডেভিড।"

"তিনবারই এক ডায়লগ?"

"হুবহু এক। মিস্টার মজুমদারকে তো জানিয়েছিলাম। নম্বর তিনটেও দিয়েছি। উনিও তো ট্রেস করতে পারেননি।"

"পারবেন কোত্থেকে?" র‍্যাচেল ফুট কাটলেন, "তোমার কলার আইডিটি বোগাস। ফোনগুলোও মনগড়া। তোমার ভীমরতি ধরেছে, বুঝলে?"

ডেভিড গোঁজ। মুখে আর বাক্যটি নেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কলহের মাঝে পড়ে মিতিনরাও চুপ। টুপুর আড়ে-আড়ে তাকাচ্ছে কড়িকাঠওয়ালা সিলিংয়ের দিকে। সেখানে চার ডানার লম্বা ডাঁটি ফ্যান ঘুরছে ঘটাং ঘট। পার্থ অবশ্য নিজস্ব কাজে ব্যস্ত। শরবত শেষ করে নিবিষ্ট মনে কাজুবাদাম চিবোচ্ছে।

একটু পর র‍্যাচেলই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন, "কতবার করে ডেভিডকে বোঝাচ্ছি খামোখা এসব ভয়-টয় পাওয়ার দরকার কী? ছেলে তো লন্ডন থেকে ডাকছে। এই যক্ষপুরী আগলে না থেকে সব বিক্রিবাটা করে সাইমনের কাছে চলে গেলেই তো হয়।"

"আপনাদের ছেলে কতদিন লন্ডনে আছেন?"

"তিরিশ বছর। আগে শেয়ারের বিজনেস করত, এখন স্পোর্টস গুড্‌সের দোকান খুলেছে। আমরা পাকাপাকি ভাবে চলে গেলে সাইমন যে কী খুশী হবে!" র‍্যাচেল ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "কিন্তু ডেভিডের ওই এক গোঁ। আব্রাহামের মতো সেও কলকাতা ছেড়ে নড়বে না। যে শহরে জন্মেছে, সেখানেই নাকি ওকে মরতে হবে। নারকেলডাঙার গোরস্থানে শুতে না পারলে ওর আত্মা নাকি শান্তি পাবে না। অথচ দেখুন, বাড়ি-জমি বিক্রি করে আমরা এখন কত আরামে লন্ডনে গিয়ে থাকতে পারি। ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে, নাতি-নাতনি আছে। জানেনই তো, আমরা ইহুদি দেশদেশান্তরে ঘুরে মরা জাত। তাই আত্মীয়স্বজনের মাঝে থাকতে পেলে আমাদের যা আনন্দ হয়, তেমনটা আর কিছুতে নয়। এই ডেভিডের জেদের জন্য সে সুখটুকুও আমার কপালে নেই।"

ডেভিড বিরক্ত স্বরে বললেন, "আমি তো এবার মরছি। তুমি তারপর যা খুশি কোরো।"

"করবই তো। সব বিক্রি করে চলে যাব।"

পার্থ চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "আচ্ছা, আপনাদের এরকম একটা জায়গায় বাড়ি, প্রোমোটাররা জ্বালাতন করে না?"

"করে না আবার! ডেভেলপার আর প্রোমোটারদের লাইন তো সেই কবে থেকে লেগে আছে," র‍্যাচেলের গলায় উষ্মা ঝরে পড়ল, "আব্রাহাম তো তাদের সোজা হাঁকিয়ে দিত। এখন ডেভিডও সেই রাস্তায় হাঁটছে। আরে শ্যামচাঁদবাবু তো ঘরের লোক। তিনিও তো কবে থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন। তাকেও তো পাত্তা দিচ্ছে না।"

মিতিন ঈষৎ ভুরু কুঁচকোল, "কে শ্যামচাঁদ?"

"শ্যামচাঁদ অগ্রবাল। আব্রাহামের খুব বন্ধু। সেই সূত্রে ডেভিডেরও। ভদ্রলোক অগ্রবাল কনস্ট্রাকশনের মালিক।"

"মিস্টার আব্রাহাম কী করে শ্যামচাঁদের বন্ধু হলেন? উনিও কি বাড়ি তৈরির লাইনে ছিলেন কখনও?"

"একেবারেই না। আব্রাহাম সঞ্চয়ের টাকা সুদে খাটাতেন। শ্যামচাঁদ ছিলেন ওর ক্লায়েন্ট। এখন শ্যামচাঁদবাবুর বয়স হয়েছে, তিনি আর ব্যবসা দেখেন না, ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন এ বাড়িতে এসে তাসের আড্ডা জমান। ওই খেলতে খেলতেই অনেকবার বাড়ি-জমির কথা তুলেছেন।"

"ও। মিস্টার আব্রাহামের তাসের নেশা ছিল বুঝি?"

"ডেভিডেরও আছে।"

"আর কে-কে আসেন খেলতে?"

"আমাদের সমাজের আছেন দু'-তিনজন। এ ছাড়া এক বাঙালি প্রোফেসর। আমরা লন্ডন থেকে ঘুরে আসার পর থেকে তো দেখছি ডাক্তারবাবুও আসছেন রোজ।"

পার্থ গোল-গোল চোখে তাকাল, "বাঙালি প্রোফেসর, ডাক্তার, তাঁরা এই পাড়ায় এসে তাস খেলেন?"

"এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?" অনেকক্ষণ পর ডেভিডের স্বর ফুটল, "প্রোফেসার হিরণ্ময় সেন আরবি পড়াতেন। আব্রাহামও এই ভাষায় যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সেই সূত্রে দু'জনের আলাপ। এবং ফ্রেন্ডশিপ। হিরণ্ময়বাবুই তো যতীনকে দিয়েছেন। আর ডাক্তারবাবুর প্র্যাকটিসে তেমন মন নেই। কাছেই তালতলায় থাকেন। বিকেল পর্যন্ত চেম্বার করে চলে আসেন আড্ডায়।"

"আজ তাঁরা আসবেন না?"

"উঁহু, শনি-রবি আসর বন্ধ থাকে।"

"কেন?"

"শনিবার স্যাবাথ। আমাদের পবিত্র বিশ্রামের দিন। জিহোভা পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় ওই দিনটাই অবসর নিয়েছিলেন তো। আমরাও ওই দিন তাস-টাস ছুঁই না। রোববারটাও আজকাল পুরো রেস্ট নিই," ডেভিডকে এতক্ষণে একটু চাঙ্গা দেখাল, "আমরা যে শুধু তাস খেলি তা নয়, সঙ্গীতচর্চাও হয়। আব্রাহাম পিয়ানো বাজাত। আমি অল্পস্বল্প ভায়োলিন জানি। ডাক্তারবাবু বাঁশিতে ওস্তাদ। র‍্যাচেল মাঝে-মাঝে গান করে। দিব্যি জমে যায় সন্ধেগুলো। এই সব নেশার টানেই তো পড়ে আছি কলকাতায়। লন্ডনে গেলে এমনটা কি পাব?"

"থামো তো," র‍্যাচেল ঝামটা দিয়ে উঠলেন, "বকতে শুরু করলে তোমার কথা আর ফুরোয় না।"

"সে তো তোমারও। কথা কি তুমি কম বলো?"

"তোমার মতো মাত্রাজ্ঞান হারাই না," র‍্যাচেল বিচিত্র মুখভঙ্গি করলেন, "জানেন, লন্ডনে গিয়ে কী কান্ড করেছিল? ওখানে ইহুদিদের একটা খুদে জমায়েত হয়েছিল। স্পেন, পর্তুগাল, হাঙ্গেরি, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি নানান দেশের ইহুদি এসেছিল সেখানে। সুযোগ পেয়ে তাদের মাঝে ডেভিড এমন একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল।"

"আষাঢ়ে বলছ কেন? আমি মিছে কথা তো কিছু বলিনি।"

"তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো, এ বাড়িতে গুপ্তধন আছে?"

"অসম্ভব কী? আব্রাহাম স্বয়ং আমায় বলেছে। তা ছাড়া আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, মাটুকদের এ বাড়িতে যা আছে, মূল্য দিয়ে তার হিসেব করা যাবে না," ডেভিড রীতিমত জোরের সঙ্গে

বললেন কথাগুলো। মাথা দুলিয়ে ফের বললেন, "আর মাটুকদের ঘরে যে মহামূল্যবান সম্পদ থাকবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। ওদের বংশের কথাটা ভাবো। যে সে নয়, স্বয়ং শ্যালোম কোহেন ওদের পূর্বপুরুষ।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "শ্যালোম কোহেন কে?"

"আমাদের কলকাতার ইহুদিদের আদি পুরুষ। একজন নমস্য ব্যক্তি। জন্মেছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পোয়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে বাগদাদ-বসরা হয়ে ইংরেজদের জাহাজে চেপে মুম্বই এসে পৌঁছন। ওখান থেকেই মেসোপটেমিয়ায়, এখন যাকে বলে ইরাক, ব্যবসা চালাতেন। মুম্বই থেকে যান সুরাট। তারপর লখনউ। অবশেষে কলকাতায় এসে থিতু হন। এই কলকাতায় বসে উনি হিরে, সিল্ক, নীল আর ঢাকাই মসলিনের বিশাল কারবার ফেঁদেছিলেন। লখনউতে বসবাসের সময়ে শ্যালোম ছিলেন সেখানকার নবাবের খাস মণিকার। হিরেজহরত খুব ভাল চিনতেন কিনা। শোনা যায় লখনউ থেকে চলে আসার সময়ে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন শ্যালোম। তাঁর কোনও ছেলে ছিল না, ছিল তিন মেয়ে। একজনের বিয়ে হয়েছিল ডোয়েক পরিবারে, একজনের সদ্‌কা, তৃতীয়জনের মাটুক। তিন জামাইকে ধনরত্ন সমান ভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন শ্যালোম। সুতরাং আব্রাহামদের এই বাড়িতে মণিমুক্তো থাকা মোটেই বিচিত্র নয়।"

"কিন্তু এর মধ্যে গুপ্তধন আসছে কোত্থেকে," পার্থ তর্ক জুড়ল, "মণিমুক্তো যাই থাকুক, তা নিশ্চয়ই মিস্টার আব্রাহামের কাছেই...।"

"না," র‍্যাচেল বলে উঠলেন, "আব্রাহামরাও চার-পাঁচ পুরুষ ধরে ওই ধনরত্নের গল্পই শুনে আসছেন। কেউ তেমন কিছু চোখেও দেখেননি, হাতেও পাননি।"

"সেই জন্যই তো বলা হচ্ছে গুপ্তধন," ডেভিড প্রায় লুফে নিলেন কথাটা। তর্জনী উঁচিয়ে বললেন, "শ্যালোম কোহেনের জামাই দানিয়েল মাটুক নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন। শুনেছি শ্যালোমের মণিমাণিক্যের মধ্যে একখানা পাথর ছিল বদখৎশানি চুনি। যার জুড়ি নাকি দুনিয়ায় নেই।"

"যত্ত সব আজগুবি গপ্পো," র‍্যাচেল ফের বিরক্তি প্রকাশ করলেন, "খামোকা তুমি গুজবটাকে উসকে দাও। কী দরকার ছিল লন্ডনের আসরে ওই কাহিনি শোনানোর? বক্তৃতাটা আবার সিডি করে এনে আব্রাহামকে উপহার দিলে।"

"আহা, আব্রাহাম তো তাতে খুশিই হয়েছিল।"

"মোটেই না। মজা পেয়েছিল। সিডিটা বন্ধুদের দেখিয়ে কত হাসাহাসি করেছিল মনে নেই?"

"তুমি ঠিক বলছ না র‍্যাচেল। কেউ হাসেনি। সবাই আগ্রহ নিয়ে দেখেছে।"

"যদি ঠিক ভাবো তো তাই। আমার আর কিছু বলার নেই।"

র‍্যাচেলের প্রতিবাদে ডেভিড যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। বসে আছেন ঘাড় ঝুলিয়ে। একটু পরে মাথা তুলে মিতিনকে বললেন, "আপনি আমাকে কী ভাবছেন জানি না। হয়তো পাগল-টাগলই মনে করছেন। কিন্তু আমার অন্তর যা বলছে, সেটাই আপনাকে জানালাম।"

মিতিন মৃদু স্বরে বলল, "আমি বুঝতে পারছি মিস্টার যোশুয়া। কিন্তু..."

"শুনুন ম্যাডাম," মিতিনকে থামিয়ে ডেভিড বলে উঠলেন, "যাঁরা চলে গিয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে আপনার আর কিছু করার নেই। তবে এখন আপনাকে একটা কাজের আগাম দায়িত্ব দিয়ে রাখতে চাই। যদি অদূর ভবিষ্যতে আমি মারা যাই এবং মৃত্যুটা যদি স্বাভাবিকও হয়, আমি চাই আপনি তার তদন্ত করুন। র‍্যাচেলের সামনেই বলছি, আপনার জন্য একটা পারিশ্রমিক ধার্য করা থাকবে, র‍্যাচেল আপনাকে সেটা দিয়ে দেবে। আশা করি আপনি এই প্রস্তাবে সম্মত?"

মিতিন সামান্য থতমত মুখে ঘাড় নেড়ে দিল।

ডেভিড কোটের পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে বাড়িয়ে দিলেন, "অনুগ্রহ করে এটা রাখুন।"

"কী আছে এতে?"

"সামান্য কিছু অর্থ।"

"কিসের জন্য?"

"আপনি যে আমার জন্য সময়টুকু ব্যয় করলেন, তারই পারিশ্রমিক।"

"এ মা, না না। আমি তো মিস্টার মজুমদারের কথা শুনে আপনার সঙ্গে শুধু আলাপ করতে এসেছিলাম।"

"মাপ করবেন ম্যাডাম। আমরা ইহুদিরা বিনা মূল্যে কোনও কাজ করি না। করাইও না। তবু যদি আপনার বাধো-বাধো ঠেকে, টাকাটা অগ্রিম হিসেবে ধরে নিন। ক'দিন পরেই তো আপনাকে তদন্তে নামতে হবে, আমি জানি।"

টুপুর থ। জ্যান্ত অবস্থায় নিজের মৃত্যুরহস্য তদন্তের টাকা দিচ্ছেন আগ বাড়িয়ে। এমন আজব মানুষ টুপুর জীবনে দ্যাখেনি।

॥ ৪ ॥

রাতে খেতে বসে পার্থ বলল, "বুঝলি টুপুর, ভেবে দেখলাম, আমাদের ধারণা ঠিক না-ও হতে পারে।"

টুপুর আহারে মন দিয়েছিল। আজ নৈশভোজের পদ একটু অন্যরকম। ডেভিড যোশুয়ার বাড়ি থেকে ফিরে কী যে খেয়াল চাপল মিতিনের, সটান ঢুকে গেল কিচেনে। নিজেই হাত লাগাল রান্নাবান্নায়। সবজি-টবজি সেদ্ধ করে গ্রেভিওয়ালা চাউমিন বানাল। সঙ্গে লেমন চিকেন। দু'টোই দারুণ হয়েছে। মিতিন মাসির হাতে কী জাদু আছে কে জানে। যাই রাঁধুক, টুপুরের মনে হয় অমৃত। নুন-মিষ্টি-টক-ঝাল সবই যেন নিখুঁত।

একটা চিকেনের টুকরো কাঁটায় গেঁথে টুপুর মুখ তুলল। ভুরু বাঁকিয়ে বলল, "কোন ধারণাটা গো?"

"ওই যে তখন বলছিলাম না ডেভিড যোশুয়া মানুষটা বদ্ধ পাগল? ওঁর মাথার চিকিৎসা হওয়া দরকার?"

হ্যাঁ, আলোচনাটা ওই লাইনেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বটে। মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িটা থেকে বেরিয়েই পার্থমেসোর সে কী হাসি, "তোর মাসি আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল রে টুপুর! ফাঁকতালে পাঁচ হাজার টাকাসুদ্ধ একটা খাম মিলে গেল। ডেভিড যোশুয়ার তো মোটেই ডিটেকটিভের প্রয়োজন নেই, ওঁর তো আসলে দরকার একজন সাইকায়াট্রিস্ট। যিনি কিনা বৃদ্ধের মন থেকে বিটকেল মৃত্যুভয়টা উপড়ে ফেলতে পারেন। ফোকটে বিপুল সম্পত্তি মিলে গেছে বলে কোথায় উনি ধেইধেই নাচবেন তা নয়, নিজেই একটা আতঙ্ক তৈরি করে সেই জুজুর ভয়ে কাঁপছেন।"

টুপুরও মেসোর তালে তাল দিয়েছে সারাক্ষণ। মিস্টার যোশুয়ার কথাবার্তা আগাগোড়াই তার কেমন অসংলগ্ন ঠেকেছে। মাঝখানে কোত্থেকে একটা গপ্পোও আমদানি করে ফেললেন ভদ্রলোক। ওই উপাখ্যান নিয়েই না টুপুর মাসির সঙ্গে ঠাট্টা জুড়েছিল, "ভবিষ্যতে গুপ্তধন উদ্ধার করে মোটা রোজগারের আশা ছেড়ে দাও গো মিতিননাসি! বরং পড়ে পাওয়া পাঁচ হাজার টাকার চটপট সদগতি করে ফেলি চলো! বুমবুমকে তুলে নিয়ে ঘ্যামচ্যাক একটা ডিনারই হোক না কোথাও একটা!"

মিতিন অবশ্য জবাব দেয়নি। আলগা হেসেছে শুধু। পার্থর এখনকার মন্তব্যেও তার কোনও ভাবান্তর নেই। চুপচাপ খাইয়ে চলেছে বুমবুমকে।

সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে টুপুর বলল, "এখন কী ধারণা হচ্ছে? ভদ্রলোক সুস্থ? যা বলেছেন সব খুব যুক্তিপূর্ণ?"

"তা হয়তো নয়। তবে কী জানিস?" পার্থ খানিকটা চাউমিন চালান করল মুখে। চিবোতে-চিবোতে বলল, "একেবারে বাতিল করাটাও বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।"

"কেন?"

"কারণ, ইহুদিদের নেচারটা যে জানি। ওরা হাড়কেপ্পন হয়। অবশ্য কারণও আছে। চিরকাল ওদের এমন তাড়া খেয়ে-খেয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরতে হয়েছে, বেহিসেবি হওয়ার ওদের জো ছিল না। উলটে যখন

BanglaBookDownload.Com

যেটুকু পেয়েছে, আঁকড়ে থেকেছে প্রাণপণে। আর সেই অভ্যেস থেকেই ওদের হাত থেকে জল গলতে চায় না।" ভিনিগারে ডোবানো কুচো লঙ্কা তুলল পার্থ। মুখে পুরে বলল, "সুতরাং ডেভিড যোশুয়ার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়াটা একেবারেই অকারণ ভাবা কঠিন।"

"কিন্তু দু'টো মৃত্যুই তো নরমাল ডেথ। ডাক্তারও তাই বলছে, পোস্টমর্টেমও...।"

"তবে উৎসবের রাতেই পটপট দু'জন মারা গেলেন, এটা একটু সন্দেহজনক তো বটেই!" পার্থ গলা ঝাড়ল। মিতিনকে বলল, "কী গো, তুমিও নিশ্চয়ই এই লাইনে ভাবছ?"

"নাহ্। মিতিন ঘাড় নাড়ল, "আমি অন্য একটা কথা চিন্তা করছি।"

"খুবই স্বাভাবিক। আমরা যা ভাবব, তুমি তা ভাববে না। কারণ, তুমি টিকটিকি। তোমার দৃষ্টি তো ঘুরপথেই যাবে।"

ব্যঙ্গটা গায়ে না মেখে মিতিন বলল, "আমি ভাবছি মিস্টার যোশুয়ার শঙ্কাটা যদি সত্যিই হয়, তা হলে মৃত্যুর ক্রমটাও নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? সেই উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?"

"সিম্পল। মিস্টার যোশুয়ার মানে আব্রাহামদের সম্পত্তি চলে আসা।"

"কিন্তু মিস্টার যোশুয়াকে সম্পত্তিটা পাইয়ে দিতে কেউ একজন চাইবে কেন? তার কী ইন্টারেস্ট?"

"এর একটা জবাব আমি দিতে পারি। জানি না তোমার মনঃপূত হবে কিনা," পার্থ দাঁতের ফাঁক থেকে মুরগির কুচি বার করল। থালার কোণে রেখে বলল, "আমার মনে হচ্ছে মিস্টার যোশুয়া নিজের ইন্টারেস্টে তোমাকে ইউজ করতে চাইছেন।"

"মানে?"

"ধরতে পারলে না? ইহুদিরা টাকাপয়সার ব্যাপারে বেজায় সাবধানি। যা একবার পায়, কোনও ভাবেই তা হারাতে চায় না।"

"ইহুদি চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান না দিয়ে কাজের কথাটা বলো।"

"আরে বাবা, ভদ্রলোকের দিদি জামাইবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক হোক কি অস্বাভাবিক, আজ নয় তো কাল নানা রকম জল্পনা হবে। মিস্টার যোশুয়াই তো বললেন, অলরেডি আব্রাহামের ভাইপোদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। অতএব তিনি গোটা প্রসঙ্গের গোড়াতেই জল ঢেলে দিতে চান। যাতে ভবিষ্যতে ওঁর ছেলেরও ওই সম্পত্তি পেতে কোনও হ্যাপা পোহাতে না হয়। কোনও মামলা-মকদ্দমায় না ফাঁসে। তাই ভেবেচিন্তে এই ডিটেকটিভ নিয়োগের পরিকল্পনা।"

"এতে ডিটেকটিভের কী ভূমিকা?"

"কিছুই না। তুমি কিছু করবেও না। করার কথাও নয়। তবে ডেভিড যোশুয়ার লাভই লাভ। পুলিশ-ডিটেকটিভ ছুঁইয়ে রেখে, মাত্র পাঁচ হাজার টাকা খসিয়ে, পাকাপাকি লোকের মুখ বন্ধ করে দিলেন।"

মিতিন স্থির চোখে তাকিয়ে আছে পার্থর দিকে। যেন ভাবছে কিছু। যেন পার্থর কথাগুলো ঠিক হজম করতে পারছে না।

টুপুরেরও একটু-একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, "মিস্টার যোশুয়া কি এতই প্যাঁচোয়া লোক? দেখে মনে হয় না কিন্তু।"

"মানুষ চেনা কি অতই সোজা রে? চোখ লাগে। আর সেই চোখ তোর মাসি ছাড়া আরও কারও-কারও আছে।"

এই বিদ্রুপটাকেও আমল দিল না মিতিন। বুমবুমের ভোজন শেষ, তাকে মুখ ধুতে পাঠিয়ে টুকটুক করে নিজের খাবার নিচ্ছে প্লেটে। মাসির উদাসীন ভাবটাই ভারী রহস্যময় লাগছে টুপুরের। মাসিকে একটু খোঁচানোর জন্য ফের কথা শুরু করল মেসোর সঙ্গে। ঝুঁকে বলল, "আর মিসেস যোশুয়াকে তোমার কেমন লাগল? উনিও কি গভীর জলের মাছ? মিস্টার যোশুয়ার মতোই?"

"না, না। তুলনায় উনি অনেক সাদামাটা। বরকে বকাঝকা করে একটু আনন্দ পান। কথাও একটু বেশি বলেন। দেখলি না, গুপ্তধনের গল্পটা উনিই শুরু করলেন?"

"উনি আর বললেন কোথায়? বরং উনি তো নিজেই বিশ্বাস করেন না।"

"করা উচিতও নয়। কবে দুশো বছর আগে কার পূর্বপুরুষ হিরেজহরত বিশেষজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁর বাড়িতে মণিমুক্তো লুকনো আছে, এমনটা ভাবাই তো মূর্খামি। আমারও তো কোনও এক পূর্বপুরুষ রাজার খাজাঞ্চি ছিলেন। লাখ-লাখ টাকা, ঘড়া-ঘড়া মোহর নিয়ে তিনি নাকি নাড়াচাড়া করতেন। তা বলে কি আমাদের বাড়িতেও ওসব থাকবে? নাকি আছে?"

"সরি স্যার।" মিতিন এবার নড়ে বসেছে, "তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

"তার মানে তুমি গুপ্তধনের গল্পটা খেয়ে গিয়েছ?"

"একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছি না। কারণ, তোমার পূর্বপুরুষের গল্পটির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু শ্যালোম কোহেন একজন ঐতিহাসিক ফিগার। এবং তিনি মোটেই হেঁজিপেঁজি লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম আরবিভাষী ইহুদি। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি ব্যবসা করে এত টাকা কামিয়েছিলেন, তিনি একজন আর্মেনিয়ানকে পনেরো হাজার টাকা ধার দেন। এবং নিজেও সুরাটে বাইশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ি কিনে ফ্যালেন। মনে রেখো, তখনকার বাইশ হাজার মানে এখনকার বাইশ কোটির শামিল। শুধু তাই নয়, মিস্টার যোশুয়া যা বলেননি, উনি শুধু লখনউয়ের নবাবেরই মণিকার ছিলেন না। পঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের দরবারেও হিরে-জহরতের সমঝদার হিসেবে তাঁর বিপুল খাতির ছিল। আর তাঁর জামাইরাও কম বিখ্যাত নন। তাঁর বড় জামাই মোজেস ডুয়েক ভারতের অনেক রাজা-মহারাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। আরও জেনে রাখো, কলকাতায় ইহুদিদের যে কবরখানাটি আছে সেটিও শ্যালোম কোহেনেরই অবদান। জমিটা ছিল এক নবাবের। তিনি বিনা মূল্যে জমিটি দান করতে চেয়েছিলেন কোহেনকে। কিন্তু ইহুদিদের তো দান নেওয়ার প্রথা নেই, তাই জমির বিনিময়ে আঙুল থেকে সোনার আংটি খুলে নবাবকে দিয়েছিলেন শ্যালোম। তাঁর রাশি-রাশি ধনসম্পদ নিশ্চয়ই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি।"

পার্থ আশ্চর্য মুখে বলল, "তুমি এত জানলে কোত্থেকে?"

"ইন্টারনেট ঘেঁটেই পেলাম। মার্কুইস স্ট্রিটে যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিয়েছি।"

"ওখানে মাটুকদের কথা পেয়েছ কিছু? কিংবা যোশুয়া?"

"সেভাবে কিছু নেই। তবে দু'টো পরিবারেরই উল্লেখ আছে। যোশুয়ারা সম্ভবত পুরোহিতের বংশ। কারণ, যোশুয়া নামের অর্থই পুরোহিত।"

"কেসটা মনে হচ্ছে তোমাকে বেশ আকর্ষণ করেছে?" পার্থ খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাসে চুমুক দিল। ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠতে-উঠতে বলল, "তুমি কি তা হলে এবার থেকে হার্ট অ্যাটাকেরও তদন্ত করবে?"

"প্রয়োজন বোধ করলে নিশ্চয়ই করব। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার পর আমারও কৌতূহল কিছু বেড়েছে, এ আমি অস্বীকার করি কী করে!"

"কী এত ইন্টারেস্টিং পেলে বলো তো? ওই ঘোস্ট কলের ব্যাপারটা? যে ভুলভাল নম্বরগুলো ট্রেসই করা যায় না?"

"অবশ্যই সেটা একটা কারণ। র‍্যাচেল যাই বলুন, মিস্টার যোশুয়াকে আমার মোটেই ভীমরতিগ্রস্ত মনে হয়নি। আর একজন আটাত্তর বছর বয়সের মানুষের কাছে বারবার ভুয়ো কল আসাটাও তো কম আশ্চর্যজনক নয়। তারপর ধরো, মিস্টার যোশুয়ার বিচিত্র সঙ্গীসাথী। কেউ ব্যবসাদার, কেউ আবার অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার...। তাঁরা আবার একদিকে তাসুড়ে, অন্য দিকে সঙ্গীতপ্রেমী। সব কিছু মিলিয়ে আমি যেন কেমন একটা মিষ্টির গন্ধ পাচ্ছি।"

পার্থ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। টিভির রিমোট হাতে বসেছে সোফায়। পুরনো দিনের হিন্দি ফিল্মের সুরেলা গান চলছে একটা চ্যানেলে, সেখানেই গেঁথে গেল। টুপুরেরও পাশে গিয়ে বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে উপায় নেই এখন। তাকে এবার ছাদে গিয়ে হাঁটতে হবে। মিতিনমাসির অর্ডার।

আধ ঘণ্টাটাক পায়চারি করে ফিরল টুপুর। পার্থমেসো তখন চোখ

গোল-গোল করে বিশ্রী একটা কুস্তি দেখছে টিভিতে। আর মিতিনমাসি নিজস্ব অফিসঘরের খুপরিটায় কম্পিউটারে নিমগ্ন। অগত্যা শুয়ে পড়া ছাড়া টুপুরের আর কাজ কী!

পরদিন থেকে আবার সেই নিস্তরঙ্গ জীবন। মর্নিংওয়াক, ব্যায়াম, অখাদ্য খাওয়া আর গরমের ছুটির হোমওয়ার্ক নিয়ে বসা। ডেভিড যোশুয়াকে নিয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্যই করছে না মিতিনমাসি। একটা উত্তেজনার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হল ভেবে টুপুর তো রীতিমত হতাশ। এর মধ্যে মাঝে-মাঝেই কলকাতার ইহুদিদের সম্পর্কে পার্থমেসোর জ্ঞান শুনতে হচ্ছে টুপুরকে। ১৮৮১ সালে নাকি কলকাতায় প্রথম ইহুদি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে নাকি এখন একটাও ইহুদি ছাত্র নেই। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কলকাতায় ইহুদিদের সংখ্যা নাকি পৌঁছেছিল ছ' হাজারে। তখন নাকি তারা একটা সমিতি গড়েছিল। খেলাধুলো করার নিজস্ব ক্লাব। 'সেমা' নামে নাকি একটা মাসিক পত্রিকাও বের করত তারা। এরকম হাজারও রকম হাবিজাবি তথ্য গিলতে-গিলতে টুপুরের তো কান ঝালাপালা।

হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেল আমূল। এমনিতে প্রতিদিনই সকাল পাঁচটায় উঠে পড়ে টুপুর। সেদিনও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু স্নিকার পরে বেরনোর আগে হঠাৎ ফোন। মিতিনমাসিই গিয়ে ধরেছে। টুকরো-টুকরো কথা বলে ফোন রেখে ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। কপাল টিপে ধরেছে।

মাসিকে এতটা বিচলিত বড় একটা দেখেনি টুপুর। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন ছিল গো?"

"মার্কুইস স্ট্রিট থেকে," মিতিন শুকনো গলায় বলল, "ডেভিড যোশুয়া যে ভয়টা পাচ্ছিলেন প্রায় সেটাই ঘটেছে।"

"মানে? ডেভিড যোশুয়া মারা গেলেন নাকি?"

"না। মৃত্যু হয়েছে র‍্যাচেল যোশুয়ার। কাল রাতে।"

॥ ৫ ॥

বাড়িটা আজ অদ্ভুত রকমের নিঝুম। আগের দিনও যে খুব সাড়াশব্দ ছিল তা নয়, কিন্তু আজ যেন কেমন ছমছম করছে। নাকি টুপুরেরই মনে হল এমনটা? র‍্যাচেল যোশুয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে বলে? হবেও বা।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়িতে পা রাখতেই যতীনের মুখোমুখি। মলিন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। নীরবে দেখিয়ে দিল দোতলায় ওঠার রাস্তা।

উপরে এসে মিতিন আর টুপুর থমকাল ক্ষণেক। ডান দিকের প্রথম ঘরটায় চার-পাঁচজন মানুষ। প্রত্যেকেই বয়স্ক এবং পোশাক চিনিয়ে দিচ্ছে তাঁরা সকলেই ইহুদি।

সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অতি নিম্ন স্বরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না?"

"আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। আর এ আমার বোনঝি ঐন্দ্রিলা। আমরা মিস্টার যোশুয়ার ডাক পেয়ে এসেছি।"

"ও। আপনি বুঝি ডিটেকটিভ? ডেভিড আমাকে আপনার কথা বলছিল বটে।" ভদ্রলোক সামান্য মাথা নোওয়ালেন, "অধীনের নাম এপ্রাহিম নাহুম।"

"আমি আপনাকে চিনি। নিউ মার্কেটের দোকানে অনেকবার দেখেছি।"

"আমি ধন্য। আবার এ কী মিসহ্যাপ হল বলুন তো? একই পরিবারে এক বছরে তিন তিনজনের মৃত্যু," এপ্রাহিম ব্যথিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন, "এখন তো মনে হচ্ছে, ডেভিড যা বলে সেটাই ঠিক। সত্যিই অশুভ কিছু একটা ঘটছে এ বাড়িতে।"

"হ্যাঁ। ঘটনাটা খুব উদ্বেগজনক।"

"আমরাও কয়েকজন মিলে সেটাই বলাবলি করছিলাম। কিছুতেই মানতে পারছি না, কাল সন্ধেবেলা যাঁকে সুস্থ হাসিখুশি দেখলাম, রাতেই কিনা শুনতে হল সে আর নেই?"

"কাল সন্ধেবেলা মিসেস যোশুয়ার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। শুধু র‍্যাচেল কেন, আমরা সমস্ত ইহুদিরাই তো মিলিত হয়েছিলাম আমাদের মঘেন ডেভিড সিনাগগে। কাল-পরশু দু' দিনই।"

"কোনও বিশেষ পরব ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। শাভুয়ত। তেত্রিশশো বছর আগে এই দিনই আমরা সিনাই পর্বতে দৈববাণী শুনেছিলাম। এখন তো কলকাতায় আমাদের কোনও পুরোহিত নেই, সমাজের মাথা হিসেবে আমাকেই এই দু'দিন প্রার্থনা পরিচালনা করতে হয়েছে। কাল তো প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর র‍্যাচেলের সঙ্গে আমার দু'-একটা বাক্যবিনিময় হল, তারপর র‍্যাচেল আর ডেভিড চলে এল বাড়িতে। তারপর রাত বারোটায় হঠাৎ ডেভিডের ফোন। খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ভোর হতে না-হতে ছুটে এসেছি," এপ্রাহিমের গলার স্বর সামান্য দুলে গেল, "র‍্যাচেলকে আমি সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। খুবই ধর্মপ্রাণ ভাল মেয়ে ছিল। ডেভিড আর র‍্যাচেলের জুড়িটাও ছিল খুব মজবুত। একে অন্যকে চোখে হারাত। এখন যে বেচারা ডেভিডের কী হবে? কী করে যে ওর দিন কাটবে?"

"মিস্টার যোশুয়া এখন কোথায়?"

"এই ঘরেই আছে।"

"আমরা কি ভিতরে যেতে পারি?"

সামান্য ইতস্তত করে এপ্রাহিম বললেন, "আসুন। তবে অনুগ্রহ করে জুতোটা খুলে...। আর দয়া করে ওখানে কোথাও বসবেন না। আমরা ইহুদিরা এগুলো খুব মানি তো।"

মিতিনের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকে টুপুর দেখল প্রকাণ্ড একটি খাটে শুয়ে আছেন র‍্যাচেল। দেখে বোঝাই যায় না দেহে প্রাণ নেই, যেন ঘুমিয়ে আছেন। পাতলা একটা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। খাটের পাশে একখানা বেঁটে টুলে ডেভিড। খাটের অন্য প্রান্তে আর একটি নিচু আসনে এক প্রবীণা ইহুদি। ঘরের বাকিরা মেঝের কারপেটে আসীন। র‍্যাচেলের মাথার দিকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি মোমবাতি। সকালের আবছা-আবছা আলোমাখা ঘরে ওই দীপশিখা যেন শোকের আবহকে আরও গভীর করেছে।

খাটের কাছে গিয়ে একদৃষ্টে র‍্যাচেলের শায়িত দেহখানা দেখছিল মিতিন। ডেভিড যোশুয়া মৃদু স্বরে বললেন, "আমি আপনারই প্রতীক্ষা করছিলাম। চলুন, নীচে গিয়ে বসি।"

বেরনোর আগে ঝটিতি একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল টুপুর। ড্রয়িংরুমের মতো না হলেও এ ঘরখানাও বিশাল। দু'-দু'খানা জাঁদরেল কাঠের আলমারি, চারখানা চেয়ার সমেত একদিকে গোল টেবিল, চেস্ট অফ ড্রয়ার, পুরনো ওয়ালপেপারে মোড়া দেওয়ালে লোহার সিন্দুক, ডেভিড আর র‍্যাচেলের যুগল ছবি....। অল্পবয়সি সুন্দরী র‍্যাচেলের ছবিও আছে একখানা। এক কিশোরের সঙ্গে। সম্ভবত কিশোরটি র‍্যাচেলের ছেলে। আছে আরও বেশ কয়েকটি পারিবারিক ফোটোগ্রাফ। ঘরে একধারে একটা মানুষপ্রমাণ আয়না। সাদা কাপড়ে ঢাকা। কেন ঢেকেছে? ইহুদিদের নিয়ম কি?

একতলার ড্রয়িংরুমে এসে সোফা নয়, সরাসরি কারপেটে বসে পড়লেন ডেভিড। আজও তাঁর পরনে কালো কোট। তবে বুকের কাছে ডান দিকটা ছেঁড়া। ইহুদিদের শোকের চিহ্ন। ডেভিডের দেখাদেখি মিতিন আর টুপুরও বসল কারপেটে।

ডেভিড নরম গলায় বললেন, "কিছু মনে করবেন না। শোকের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের উচ্চাসনে বসার নিয়ম নেই।"

মিতিন বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। মিসেস যোশুয়ার মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। এই মুহূর্তে আপনাকে সান্ত্বনা জানানোর কোনও ভাষা নেই।"

ডেভিড নিশ্চুপ।

মিতিন আবার বলল, "আপনার ছেলে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে

গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। রাতেই তাকে জানিয়েছি। সম্ভবত আজ লন্ডন থেকে ফ্লাইট ধরবে। আশা করছি, কাল পৌঁছে যাবে," বলতে-বলতে স্বরটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল ডেভিডের, "দেখলেন তো আবার মৃত্যু এসে কেমন হানা দিল এ বাড়িতে?"

"হুঁ।"

"ঠিক আবার সেই পরবের দিন। যাওয়ার কথা ছিল আমার, ভুলক্রমে র‍্যাচেল চলে গেল।"

"মিস্টার নাহুম বলছিলেন, আপনারা কাল সন্ধেবেলা সিনাগগে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। এপ্রাহিমই তো টেন কম্যান্ডমেন্ট্স পাঠ করল। তারপর বাড়ি ফিরে বেশ আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছিল। গানবাজনা, হাসি-রঙ্গ। তারপর কী যে হয়ে গেল!"

"কে-কে এসেছিল কাল?"

"যারা সাধারণত আসেন। আমাদের বন্ধুরা। ইহুদি সমাজের ছিল মাত্র দু'জন। বেঞ্জামিন আর সারা। আপনারা তো সারাকে দেখলেন। উপরে আমার স্ত্রীর পাশে বসে আছেন।"

"উনি বুঝি আপনার মিসেসের খুব বন্ধু ছিলেন?"

"হ্যাঁ। ওরা দু'জনে মিলেই তো খাবার-টাবার সার্ভ করছিল। তখনও র‍্যাচেল রীতিমত হেইল অ্যান্ড হার্টি।"

"অসুস্থ হলেন কখন?"

"শরীর খারাপ তো দেখিনি। অন্তত আমার নজরে পড়েনি।"

"তা হলে কী করে মারা গেলেন? কখন মারা গেলেন?"

"সময় তো সঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত তখন এগারোটা বাজে। কাল তো খুব গরম ছিল, সকলকে বিদায় জানিয়ে আমি একটু বাইরেটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ যতীন এসে বলল, ম্যাডামের গতিক ভাল ঠেকছে না, আপনি এক্ষুনি একবার উপরে যান। দোতলায় উঠে দেখি র‍্যাচেল যেন কেমন অদ্ভুত ভাবে বসে আছে চেয়ারে। মুখ ঝুঁকে পড়েছে টেবিলে। দু' হাত ঝুলছে দু' দিকে। ভীষণ ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করলাম। সে বেচারা তখনও বাড়ি পৌঁছয়নি, কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাক করে এল। র‍্যাচেলের নাড়ি দেখেই বলল সব শেষ।"

"তক্ষুনি আমাকে ফোন করলেন না কেন?"

"আমার মাথা কাজ করছিল না ম্যাডাম। তা ছাড়া আমাদের ইহুদিদের অনেক নিয়মকানুন আছে। নিজেদের সমাজের লোকজনদের খবর দিতে হয়, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থার জন্য জানাতে হয়। প্রথমে সারা-বেঞ্জামিনকে ফোন করেছিলাম, তারপর একে একে...। মৃতদেহ তো একা ছাড়ার নিয়ম নেই, তাই রাতভর আমরা ওখানেই আছি।"

"ডাক্তারবাবু কি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছেন?"

"না। বললে হয়তো লিখে দিত। আমি নিইনি," ডেভিড একটু চুপ থেকে বললেন, "তখনই ডাক্তারকে বলে দিয়েছি এবার আমি কারও আপত্তি শুনব না। র‍্যাচেলের বডির পোস্টমর্টেম আমি করাবই। ওর মৃত্যুর সঠিক কারণ আমি জানতে চাই। ডাক্তারও বলল, রাত্তিরটা ভাবুন। যদি সিদ্ধান্ত বদলান, তো সকালে এসে সার্টিফিকেট দিয়ে যাব। নইলে পোস্টমর্টেমের জন্য রেফার করব।"

"ও। তা এখন কী ভাবছেন?"

"আমি সিদ্ধান্তে অটল। ডাক্তারও এক্ষুনি এসে পড়বে। তারপর পুলিশকে...," ডেভিডের গলাটা করুণ হয়ে গেল, "ম্যাডাম, আপনার তো অনেক চেনাজানা, দেখুন না যদি বলে-কয়ে আজকের মধ্যে পোস্টমর্টেমটা করিয়ে দিতে পারেন, তা হলে বড় উপকার হয়।"

"কালই কবর দিতে চান, তাই তো?"

"না। আগামী কাল শনিবার। স্যাবাথ। ওই দিন আমাদের কবর দিতে নেই। আগামী কালটা র‍্যাচেল পিস হ্যাভেনের বরফের বিছানায় ঘুমোবে। আশা করছি, তার মধ্যেই সাইমনও পৌঁছে যাবে। তারপর রোববারই...। আমি সেভাবেই সব কিছু রেডি করতে বলেছি নাথানকে।"

"কে নাথান?"

"যে আমাদের কবর দেওয়ার ব্যাপারস্যাপারগুলো দেখভাল করে। খুব ভাল ছেলে। এই তো, খবর পেয়ে সকালেই এসেছিল...।"

কথার মাঝেই দরজায় এক গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সি। এক হাতে ব্রিফকেস, অন্য হাতে হেলমেট। মিতিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সসম্ভ্রমে বললেন, "আপনিই তো সেই বিখ্যাত মহিলা ডিটেকটিভ?"

মিতিনের ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি, "আপনি আমায় চেনেন?"

"টিভিতে দেখেছি। অপরাধীদের মানসিকতা নিয়ে আপনি একটা টক শো-তে ছিলেন। আমি তো নানা ধরনের রোগী চরিয়ে খাই। তার মধ্যে খুনি-বদমাশও থাকে। আপনার বক্তব্যটা শুনতে তাই বেশ লাগছিল।"

"ও। আপনিই তা হলে মিস্টার যোশুয়াদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান?"

"ওই পরিচয়টা এখন গৌণ হয়ে গিয়েছে। হেলমেট পাশে রেখে ডাক্তারবাবু বসে পড়েছেন কারপেটে, "আমি রণেন সামন্ত। এঁদের পরিবারেই একজন। তাই না ডেভিড?"

"বটেই তো। বন্ধুও বটে। ছোট ভাইও বটে। তুমি পাশে-পাশে থাকো বলে কত ভরসা পেতাম। কিন্তু তুমি এবারও শেষরক্ষা করতে পারলে না।"

"আমার কপাল ডেভিড। কেন যে সুস্থ লোকগুলো এভাবে চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়!" রণেন সামন্তর মুখ ম্রিয়মাণ। অনুচ্চ স্বরে বললেন, "কী ঠিক করলেন? পোস্টমর্টেমই তো?"

"সেটাই তো উচিত। মনে যখন একটা খটকা আছে, মীমাংসা একটা হয়ে যাওয়াই ভাল।"

পাশে রাখা ব্রিফকেসখানা খুললেন রণেন। ডেভিডের ইচ্ছেমাফিক খসখস কলম চালাচ্ছেন। মিতিন একটু দূরে উঠে গিয়ে ফোন করল অনিশ্চয় মজুমদারকে। সংক্ষেপে জানাল ঘটনাটা এবং ময়নাতদন্তের জরুরি প্রয়োজনটুকুও। ফিরে এসে ডেভিডকে বলল, "চিন্তা করবেন না। আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এসে যাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। যদি ময়নাতদন্তে কিছু পাওয়া যায়...। আমি নিশ্চিত কিছু একটা পাওয়া যাবেই। আপনি কেসটার তদন্ত করবেন তো?"

"আমি আপনার পাশে আছি মিস্টার যোশুয়া," শোকার্ত বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে রণেনের দিকে ফিরল মিতিন, "আপনাকে কি একটা-দু'টো প্রশ্ন করতে পারি ডক্টর সামন্ত?"

"শিওর। ডেভিডের পরিবারের স্বার্থে আপনি আমায় হাজারটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন।"

"কাল রাত্তিরে আপনি যখন ফিরে এলেন, তার কতক্ষণ আগে মিসেস যোশুয়া মারা গিয়েছে বলে আপনার ধারণা?"

লেখা শেষ করে কাগজখানা প্যাড থেকে ছিঁড়ছিলেন রণেন। একটা ভাঁজ করে ডেভিডকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার ডাক্তারি জ্ঞান বলছে বড়জোর মিনিট পনেরো-কুড়ি। কারণ, তখনও ম্যাডামের বডি ওয়াজ নট দ্যাট কোল্ড।"

"তা হলে মিসেস যোশুয়ার মৃত্যুর সময়টা কী রকম দাঁড়াচ্ছে?"

"ডেভিডের ডাক পেয়ে আমি এ বাড়ি এসেছিলাম এগারোটা পাঁচে। অতএব ম্যাডামের ডেথটা কোনও ভাবেই দশটা পঞ্চাশের আগে নয়।"

"আচ্ছা, মিস্টার আব্রাহাম, মিসেস আব্রাহাম এবং মিসেস যোশুয়া, তিনটে মৃতদেহই তো আপনি দেখেছেন? তিনটে মৃত্যুই কি অবিকল এক রকম বলে আপনার মনে হয়েছে?"

"হ্যাঁ। মোটামুটি সিমিলার। তিনজনেরই আকস্মিক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু।"

"ব্যাপারটা কি খুব স্বাভাবিক?"

"অস্বাভাবিকই বা বলি কী করে। তেমন কোনও প্রমাণ তো পাইনি। তবে...।"

"কী তবে?"

"কিছু-কিছু আনন্যাচারাল ডেথেও হার্ট অ্যাটাকই ঘটে। কিন্তু আদতে সেটা খুন।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন যদি ব্লাডে এয়ার বাব্‌ল ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়। তারপর ধরুন, এমন কিছু বিষ আছে যা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে রক্তে মিশলে হার্ট চিরতরে থেমে যাবে। পোস্টমর্টেমে তা ধরা পড়া কঠিন। অনেক সময়ে ভিসেরা পরীক্ষাতেও তা পাওয়া যায় না।"

"কী বিষ?"

"আছে নানান রকম। আফ্রিকানরা গাছগাছালি থেকে তৈরি করে। তিরের ফলায় মাখানোর জন্য। ওই তির সামান্য ক্ষত তৈরি করলেও মৃত্যু এবং সেই মৃত্যু সিম্পল হার্ট অ্যাটাকই দেখাবে।"

"হুম," মিতিন কী যেন ভেবে নিয়ে ডেভিডকে বলল, "মিস্টার যোশুয়া, আপনি যে ভয় দেখানো কলগুলো পেয়েছিলেন, সেই নম্বর তিনটে আমায় দিতে পারেন?"

"এক্ষুনি? আমাকে তো উপরে গিয়ে নোটবুক দেখে..."

"নো প্রবলেম। আমায় ফোনে জানিয়ে দেবেন।" মিতিন ব্যাগ খুলে নিজের কার্ডটা বাড়িয়ে দিল, "এখানে ল্যান্ডলাইন ছাড়া আমার মোবাইল নম্বরও আছে। আমরা তবে আপাতত চলি?"

ডেভিড আর রণেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের গাড়ি পর্যন্তও পৌঁছয়নি মাসি-বোনঝি, পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। লাফিয়ে নামলেন এক অফিসার, দুই কনস্টেবলকে নিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন বাড়ির অন্দরে।

মিতিন স্টার্ট দিল গাড়িতে। গেটের মুখে থামতে হল। প্রবেশ করছে আর একখানা প্রাইভেট কার। পিছনের সিটে এক বয়স্ক অবাঙালি ভদ্রলোক। ফরসা গোলগাল মুখ, মাথাজোড়া টাক, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি।

মিতিন ফিসফিস করে বলল, "সম্ভবত শ্যামচাঁদ অগ্রবাল।"

"দাঁড়িয়ে গেলে হত না?" টুপুরের চোখ চকচক, "ভদ্রলোককে একটু বাজিয়ে দেখতে।"

"এক্ষুনি কী দরকার। দেখা তো হবেই। আজ নয়তো কাল," গাড়িটাকে কাটিয়ে বেরিয়ে এল মিতিন। ঈষৎ আনমনা মুখে বলল, "একটা পুরনো কেস মনে পড়ছে, বুঝলি।"

"কী গো?"

"বছর কুড়ি আগে ভাগলপুরে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল। ওখানে রইস বাঙালি পরিবারগুলোয় গুরু সেজে বসেছিল সাধুটা। তখনই বেশ কয়েকটি পরিবারের কর্তার আকস্মিক মৃত্যু হয়। সাধুটাই কিছু একটা করছে ভেবেছিল পুলিশ। কিন্তু ধরতে পারেনি। পরে দেখা গিয়েছিল, ওই পরিবারগুলোর অনেক ধনরত্নই ওই সাধুবাবার মতো নিপাত্তা। বছর চারেক আগে গোয়াতেও সিমিলার ইন্সিডেন্ট ঘটেছিল। তিন-চারটে পর্তুগিজ পরিবারে পরপর অদ্ভুত ভাবে কয়েকটা মৃত্যু। সেখানেও একজন সাসপেক্ট ছিল, ধরা পড়েনি।"

"সেই সাধু কি এবার কলকাতায় হানা দিয়েছে? অস্বাভাবিক মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে চালাচ্ছে?"

মিতিন জবাব দিল না। আদৌ টুপুরের প্রশ্নটা শুনল কি, বুঝতে পারল না টুপুর।

॥ ৬ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল এখনও ফুরোয়নি। নারকেলডাঙার ইহুদিদের কবরখানা থেকে ফিরছিল টুপুররা। দুপুর আড়াইটে নাগাদ মেগন ডেভিড সিনাগগ ঘুরিয়ে গোরস্থানে আনা হয়েছিল সাদামাঠা কাঠের কফিনে ভরা র‍্যাচেলের দেহ। একটু আগে প্রার্থনা-টার্থনা সেরে তাঁকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট একটা জমায়েত মতো হয়েছিল, চলে গিয়েছেন সকলে। শুধু টুপুররাই রইল আরও খানিকক্ষণ। ঘুরে-ঘুরে দেখছিল ভিতরটা। ঝোপঝাড় জঙ্গল মতো হয়ে গিয়েছে, তারই মাঝে-মাঝে কত অজস্র কবর। কোনওটার উপরে উঁচু-উঁচু সৌধ, আবার কোনওটায় বা ছোট-ছোট ফলক। প্রতিটি সমাধিতেই দুর্বোধ্য হিব্রু ভাষায় কিছু লেখা। তার নীচে ইংরেজিতে নাম-ধাম-জন্ম-মৃত্যুর তারিখ। নামগুলো দেখতে-দেখতে, পড়তে-পড়তে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়, পুরনো কলকাতার একটা ছবি ভেসে ওঠে চোখের পরদায়। পার্থ তো দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছিল গোরস্থানের পাহারাদারটির সঙ্গে। মিতিন না তাড়া লাগালে তাকে হয়তো সন্ধের আগে বেরই করা যেত না।

আজ স্টিয়ারিংয়ে পার্থ। শিয়ালদহ ফ্লাইওভার পেরিয়ে আলগা প্রশ্ন ছুড়ল, "এখন কি সোজা গৃহে প্রত্যাবর্তন?"

পিছনের সিট থেকে মিতিন বলল, "উঁহু। একবার মার্কুইস স্ট্রিটে যাব।"

"কী হবে গিয়ে? শোকের বাড়ি... ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনিরা ভিড় করে আছে।"

"তা হোক। অনেকেই থাকবে... সম্ভব হলে আজই একটু কথাবার্তা বলব।"

"প্রয়োজন আছে কোনও? পোস্টমর্টেমে তো কিছুই মেলেনি।"

সত্যিই তাই। এবারও ময়নাতদন্তে কোনও অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায়নি। সাধারণ হার্ট অ্যাটাক বলেই রায় দিয়েছেন মর্গের ডাক্তার। গতকাল খবরটা পেয়ে গুম হয়ে গিয়েছিলেন ডেভিড। পরে অবশ্য তিনি মিতিনকে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বিশ্বাস থেকে একচুল নড়তে রাজি নন, নিজের মতো করে তদন্ত চালাক মিতিন। টুপুরও অবশ্য ভেবে পাচ্ছিল না এর পর মিতিনমাসির কী-ই বা করার থাকতে পারে।

পার্থকে জবাব দিতে গিয়ে মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল সামান্য। ভারী গলায় বলল, "পোস্টমর্টেমের রিপোর্টই ধ্রুব সত্য নয়। তার চোখেও তো ধুলো দেওয়া যায়।"

পার্থর পাশ থেকে টুপুর বলে উঠল, "তুমি কি ওই ডক্টর সামন্তর কথা ধরে বসে আছ? মিসেস যোশুয়ার বডিতে এয়ার বাব্‌ল ঢোকানো হয়েছে? কিংবা কোনও জটিল বিষ-টিস্?"

অসম্ভব তো নয়?"

"কিন্তু তা হলে তো বডিতে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন থাকবে। তেমন কিছুও তো মেলেনি।"

পার্থ বলল, "একদম ঠিক। যত ছোট ক্ষত হোক, মৃত্যুর পর সেখানে একটা কালো স্পট হবেই।"

"সরি। এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তা ছাড়া মিসেস যোশুয়ার যা বয়স, তাতে এমনিতেই চামড়ায় নানা স্পট থাকতে পারে। সুতরাং একটা কালচে ফুটকি খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব," মিতিন সিটে হেলান দিল। দৃষ্টি গাড়ির বাইরে মেলে দিয়ে বলল, "তবে ডেডবডির একটা-দু'টো অস্বাভাবিকতা কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি।"

"যেমন?"

"প্রথমত, মিসেস যোশুয়ার মৃত্যু যদি এগারোটায় ঘটে থাকে, আমি তাঁকে দেখেছি তার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে। এই সময়ের মধ্যে মৃতদেহ শক্ত হতে শুরু করে ঠিকই, কিন্তু অতটা বিবর্ণ হওয়ার তো কথা নয়। তা ছাড়া ওঁর হাতের একটা অংশ চাদরের বাইরে ছিল। সেখানে কবজির কাছের জায়গাটা একটু যেন বেশি কালচে দেখাচ্ছিল।"

"ঘরে তো তেমন আলো ছিল না। তুমি তার মধ্যেই বুঝতে পারলে?"

"একেবারে নিশ্চিত নই। তবু মনে হল...," মিতিন বাইরে থেকে মুখ ফেরাল, "এবার সক্কলকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখি। সারকামস্টেনশিয়াল এভিডেন্স থেকে তো কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। এমনকী, প্রমাণও।"

পার্থ ঠাট্টা ছুড়ল, "একেই বলে নেই কাজ তো খই ভাজ!"

"ভুলে যেও না, খই ভেজেও অনেকের পেট চলে মশাই।"

হালকা হাসিঠাট্টায় কেটে গেল বাকি পথটুকু। মিস্টার যোশুয়ার

ফটকে যতীন দাঁড়িয়ে। মিতিন অবাক মুখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখানে কেন?"

"স্যার আমায় থাকতে বলেছেন। যদি চেনাজানা কেউ আসে, ভিতরে নিয়ে যেতে।"

পার্থকে ভিতরে গাড়ি রাখতে বলে মিতিন গেটেই নেমে পড়ল। দেখাদেখি টুপুরও। যতীনের সামনে এসে মিতিন বলল, "তোমার মুখ-টুখ তো খুব শুকনো হয়ে আছে। ম্যাডামের মৃত্যুতে তুমিও দেখছি খুব শক পেয়েছ?"

যতীন অল্প মাথা নাড়ল। বিড়বিড় করে বলল, "ম্যাডাম আমায় বড় স্নেহ করতেন। প্রায় ছেলের মতো দেখতেন। আমার আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

"বুঝতে পারছি। তা তুমিই তো বৃহস্পতিবার রাতে স্যারকে গিয়ে প্রথম দুঃসংবাদটা দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। নীচ থেকে গ্লাস-প্লেট জড়ো করে উপরের রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই নজরে এল ম্যাডাম যেন কেমন করছেন।"

"ঠিক কী করছিলেন উনি?"

"বুক চেপে ধরে জোরে-জোরে শ্বাস টানছেন। আর মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। তারপর আচমকাই ঘাড়টা কেমন ঝুলে গেল, উনি নেতিয়ে পড়লেন।"

"অর্থাৎ তখনও উনি জীবিত?"

"হ্যাঁ। তবে স্যার আসার পরে আর বোধ হয় প্রাণ ছিল না।"

"সময়টা মনে আছে?"

"তখনও এগারোটা বাজেনি। স্যার ডাক্তারবাবুকে ফোন করার পর বড় ঘড়িতে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল।"

"তখন তো বাড়িতে আর কোনও অতিথি নেই?"

"না। দশটার পর থেকেই তো একে-একে চলে গেলেন। সাড়ে দশটার পর বাড়ি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।"

"মোট ক'জন ছিলেন সেদিন?"

"স্যার আর ম্যাডামকে বাদ দিয়ে পাঁচজন। বেঞ্জামিন সাহেবরা স্বামী-স্ত্রী, প্রোফেসর স্যার, শ্যামবাবু, আর ডাক্তারবাবু।"

"কে কার পর বেরিয়েছিলেন, তোমার মনে আছে?"

"দাঁড়ান, একটু চিন্তা করে বলি," যতীনের চোখ সরু হল। ঠোঁটখানা ছুঁচলো করে বলল, "প্রথমে গেলেন প্রোফেসর স্যার, তারপর স্যার-ম্যাডামরা, তারপরে শ্যামবাবু আর ডাক্তারবাবু তো একসঙ্গে গল্প করতে-করতে...।"

"তা কী করে হয়? ডাক্তারবাবুর তো স্কুটার, শ্যামবাবুর তো মোটরগাড়ি?"

"ঠিক কথা ম্যাডাম। তবে যে-যার গাড়িতে ওঠার আগে অনেকক্ষণ কথা বলছিলেন, আমি দেখেছি। স্যারও তো ছিলেন সঙ্গে। ওঁরা চলে যাওয়ার পরও স্যার দাঁড়িয়ে রইলেন।"

"হুম, সেদিন সন্ধে থেকে কী-কী ঘটেছিল একটু বলবে?"

"স্যার আর ম্যাডাম তো বেঞ্জামিনসাহেবের গাড়িতে ওঁদের ধর্মস্থানে গিয়েছিলেন। ফিরলেন প্রায় আটটায়। বাকিরাও তার পরপরই এলেন। দুপুরে আমি আর মেমসাহেব কিছু খাবার তৈরি করে রেখেছিলাম। সেগুলো পরিবেশন করা হল। বেঞ্জামিনসাহেব বাড়িতে তৈরি করা রেড ওয়াইন এনেছিলেন, আমি সেটা গ্লাসে-গ্লাসে ঢেলে দিলাম। উৎসবের রাতে নাকি ওটা খেতে হয়। তারপর গানবাজনা, গল্পটল্প হচ্ছিল। তখন আমি ওঘরে ছিলাম না। পরে পার্টি শেষ হওয়ার মুখে-মুখে ডেভিডস্যার আমায় একবার ডেকেছিলেন। র‍্যাচেল ম্যাডামের হাতের গ্লাসটা কী করে যেন পড়ে ভেঙে গিয়েছিল, অনেকটা পানীয় পড়েছিল ওঁর গায়ে। আমাকে বললেন কাচ-টাচগুলো পরিষ্কার করতে। ম্যাডামকে একটা তোয়ালেও এনে দিলাম হাত আর ড্রেস মোছার জন্যে।"

"তারপর?"

"আর তো তেমন কিছু ঘটেনি। বেঞ্জামিন সাহেবরা চলে যেতে ম্যাডাম উঠে গেলেন উপরে। তারপর তো পার্টিও শেষ হয়ে গেল।"

"এর পর ম্যাডামকে ফের দেখলে একেবারে শেষ সময়ে? তাই তো?"

জবাব দেওয়ার আগে যতীন সহসা শশব্যস্ত। একটা পুরনো মারুতি ঢুকছে। চাপা স্বরে বলে উঠল, "প্রোফেসরস্যার এসে গিয়েছেন।"

ফটকের মুখ থেকে সরে দাঁড়াল মিতিন। যতীনকে বলল, "ওঁর সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দাও।"

আলাপের পালা সাঙ্গ হতেই যতীন ফের গেটে গিয়ে দাঁড়াল। মিতিনদের দেখে হিরণ্ময় যেন তেমন খুশি নন। কাঠ-কাঠ গলায় বললেন, "ডেভিড কিন্তু তিলকে তাল করছে। পুলিশ-ডিটেকটিভের ঝামেলায় না জড়ালেই ভাল করত।"

সাদামাঠা চেহারার চশমাধারী বছর সত্তরের হিরণ্ময়কে একবার জরিপ করে নিল মিতিন। শান্ত স্বরেই বলল, "মিস্টার যোশুয়াকে আপনার মতামতটা জানিয়েছিলেন কী?"

"বহুবার। শুধু ডাক্তারই ওর তালে তাল দিয়ে যাচ্ছে," হিরণ্ময় আস্তে-আস্তে এগোচ্ছেন গাড়িবারান্দার দিকে। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "তা সন্দেহের কিছু পেলেন?"

"খুঁজছি।"

"বেশ। চালিয়ে যান অনুসন্ধান।"

"আপনার দেওয়া যতীন ছেলেটি কিন্তু বেশ স্মার্ট।"

হিরণ্ময় যেন চমকে তাকালেন। পরক্ষণে গলা ঝেড়ে বললেন, "একটু চালাক-চতুর না হলে কি বুড়োবুড়িদের সামলেসুমলে রাখতে পারে?"

"ঠিক," মিতিন মৃদু হাসল, "তা আপনিও কি ডাক্তারবাবুর মতো কাছাকাছিই থাকেন?"

"খুব দূরে নয়। আমার বাড়ি ভবানীপুর। সাত নম্বর নন্দন রোডে।"

"নিজেদের বাড়ি?"

"জেরা করছেন নাকি?" হিরণ্ময় খর চোখে তাকালেন, "আমার কিন্তু এসব একদম পছন্দ নয়। আর এ বাড়ির বর্তমান পরিবেশ আপনার কৌতূহলের পক্ষে একেবারেই বেমানান।"

কথাগুলো বলেই বাড়ির অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন হিরণ্ময়। দু'-এক সেকেন্ড থমকে থেকে মিতিনরাও প্রবেশ করল একে-একে। ডেভিড আর সাইমন ড্রয়িংরুমের কারপেটে বসে। হিরণ্ময়ও স্থান নিয়েছেন তাঁদের পাশে।

মিতিন নিচু স্বরে ডেভিডকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কতক্ষণ আগে ফিরলেন?"

"সময়ের আর হিসেব নেই ম্যাডাম। আধঘণ্টাটাক হবে।"

"আমরা এসে আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?"

"না-না। আপনারা শবানুগমন করেছেন। আজ আপনারা এই পরিবারের সম্মাননীয় অতিথি। রেবেকা, মানে আমার সাইমনের বউ, ডিমসেদ্ধ তৈরি করছে। অনুগ্রহ করে খেয়ে যাবেন। এটা আমাদের রীতি।"

হিরণ্ময় সামান্য অপ্রস্তুত স্বরে বললেন, "সরি ডেভিড। আমারও আজ সিমেট্রিতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বাড়িতে লোক এসে গেল বলে বেরোতে পারলাম না।"

"তো কী আছে? মনে-মনে তো তুমি পাশেই ছিলে। নিশ্চয়ই র‍্যাচেলের আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করেছ?"

"অবশ্যই। তবে নিজের হাতে কবরে মাটি দিতে পারলাম না, এ আক্ষেপ আমার রয়েই গেল," হিরণ্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নরম গলায় বললেন, "তোমাদের তো আরও সাতদিন শোক পালন করতে হবে, তাই না?"

"সূর্যাস্তের আগে ফিরেছি। সুতরাং আরও ছ' দিনই যথেষ্ট। তবে এখন তো ধাপে-ধাপে অ্যাভেলিউট চলবে। সাত দিন, তিরিশ দিন, এক বছর। সাইমনরা অবশ্য তিন দিন পরে ফিরে যাচ্ছে। ওর ব্যবসা, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, রেবেকার অফিস।"

"হ্যাঁ প্রোফেসর। আমার কোনও উপায় নেই," বছর পঞ্চাশের

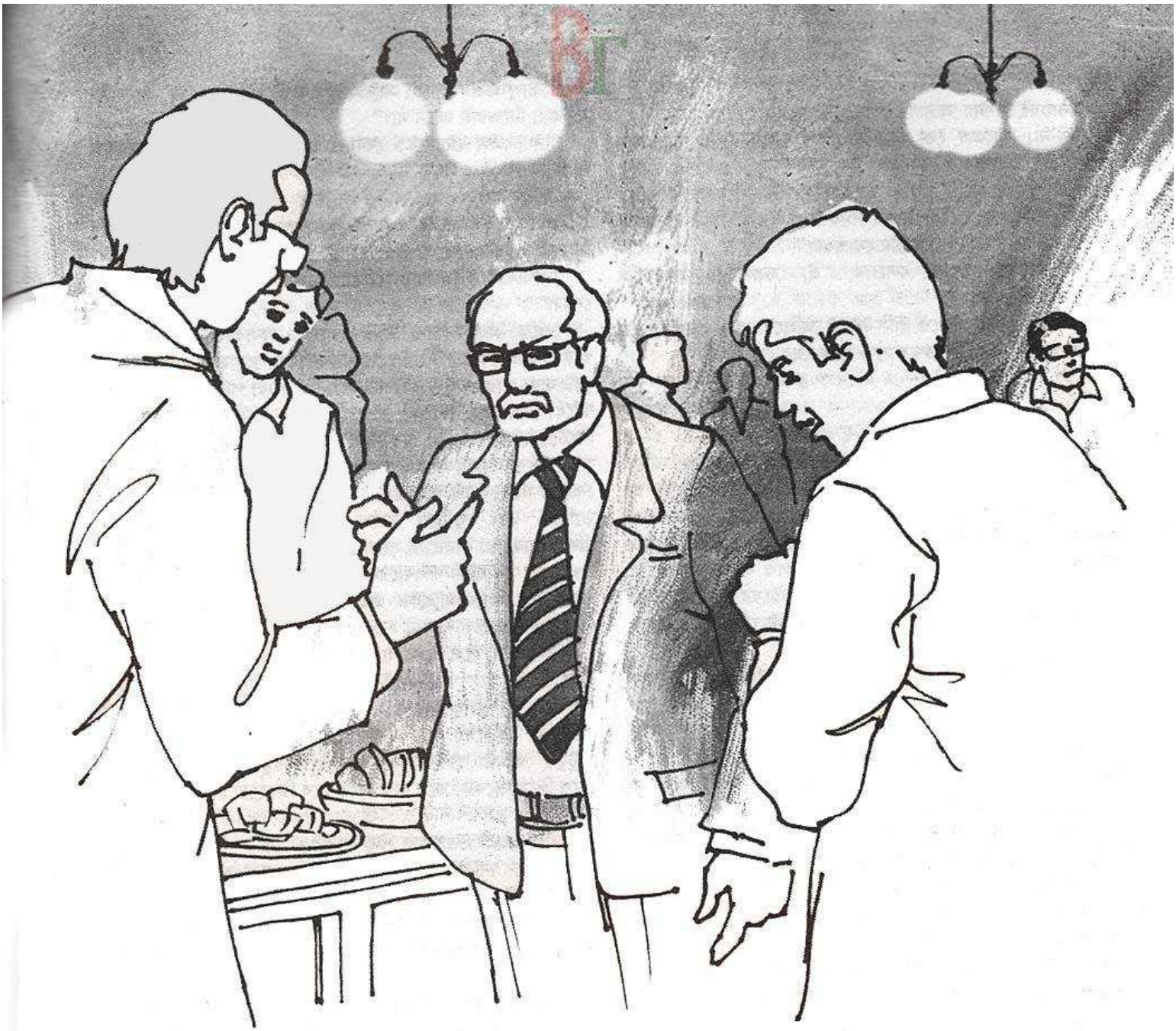

সাইমনের স্বর শোনা গেল। ডেভিডের মতোই তাঁর পরনে এখনও কবরখানার পোশাক। ফুলহাতা কালো কোটের বাঁ দিকে বোতামঘর লম্বা করে কাটা। মুখমণ্ডলে দু'-তিন দিনের না কামানো দাড়ি। চুল উসকোখুসকো। চোখে উদভ্রান্ত ভাব। নিচু গলায় বললেন, "বাবাকে কতবার বলছি, এবার ঘরদোরে তালা মেরে দাও। বেঞ্জামিন আংকলকে চাবি দিয়ে পাকাপাকি চলে এসো লন্ডনে। শুনছেনই না।"

"এক্ষুনি-এক্ষুনি তা হয় নাকি? র‍্যাচেল এই শহরে শেষ নিশ্বাস ফেলল। তার প্রথম বছরের ক্রিয়াকর্ম না হলে কি আমি নড়তে পারি?"

"এ সবই তোমার বাহানা। আমি কি আজ প্রথম তোমায় চলে আসতে বলছি? এই শহরের আর আছেটা কী? ডেভেলপার আর ধান্দাবাজ প্রোমোটারে চারদিক ছেয়ে গিয়েছে। শহরের মধ্যিখানে এই জমিবাড়ি নিয়ে তুমি প্রতিদিন তাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠছ।"

"আমিও তো ডেভিডকে তাই বলি," হিরণ্ময় বলে উঠলেন, "মোটামুটি ভাল দাম পেলে বেচে দিয়ে ছেলের কাছে চলে যাও।"

"মাঝখান থেকে আমি মাকে হারালাম," সাইমন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "এখন বলছ মাকে নাকি কেউ মেরে দিয়েছে। লন্ডনে থাকলে এমনটা কখনও ঘটত না।"

ডেভিড অসহায় স্বরে বললেন, "রাগ করছিস কেন? জিহোভা তার কপালে মৃত্যু লিখে রেখেছিলেন।"

"ভাগ্যের দোহাই পেড়ো না ডেভিড," হিরণ্ময় ঈষৎ বিরক্ত মুখে বললেন, "অত যদি জিহোভার উপর বিশ্বাস, তা হলে ডিটেকটিভ লাগিয়েছ কেন?"

"বা রে, আমাকে প্রাণের ভয় দেখানো ফোন আসছে, তারপর বাড়িতে একের পর-এক মৃত্যু...। আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব?"

"ওটাও তোমার আর একটা ওজর," সাইমন গজগজ করছে, "ওরকম ফোন কি আমিও পাইনি? সেভ ইওর পপ! রিমুভ হিম ফ্রম ক্যালকাটা!"

"তোমার কাছেও ফোন গিয়েছে?" ডেভিডের চোখে বিস্ময়, "কই, বলোনি তো?"

"তুমি আরও নার্ভাস হতে পার ভেবে জানাইনি। তবে ইহুদিরা তো তাদের জন্মলগ্ন থেকে এই ধরনের শাসানি শুনে আসছে, তাই আমলও দিইনি খুব একটা।"

"কোত্থেকে গিয়েছিল ফোনটা? নিশ্চয়ই কলকাতা?"

"না। একটা স্ট্রেঞ্জ নম্বর। সম্ভবত আমেরিকার।"

মিতিন বহুক্ষণ ধরে শুনছিল তিনজনের কথোপকথন। হঠাৎ বলে উঠল, "কবে পেয়েছিলেন ফোনটা স্মরণে আছে কী?"

সাইমন সামান্য চিন্তা করে বললেন, "তা বেশ কয়েক মাস আগে

হবে।"

"নিশ্চয়ই মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর আগে নয়?"

"না-না। আংকল তো গেলেন রোশ হাসান্নার সময়ে। তখন আমাদের ইহুদিদের পরব চলছিল। ইন ফ্যাক্ট ফোনটা পেয়েছি সম্ভবত ক্যাথলিন আন্টির মৃত্যুর পর। এ বছর জানুয়ারির শেষে।"

"আপনিও তো মোটামুটি ওই সময় থেকেই...?" মিতিন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, "তাই না মিস্টার যোশুয়া?"

বৃদ্ধ মানুষটি অস্ফুটে বললেন, "হুঁ। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে...।"

মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। চোখ ঘুরিয়ে দেখছে ঘরের সকলকে। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তার চোয়াল।

॥ ৭ ॥

তিন-তিনটে দিন কেটে গেছে। তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে, আদৌ এগোচ্ছে কি না, কিছুই বুঝতে পারছিল না টুপুর। মিতিনমাসি হয় ঘণ্টার পর-ঘণ্টা কম্পিউটারে বসে থাকে, নয়তো মোবাইলে বকবক করে এর-ওর-তার সঙ্গে। হুটহাট বেরিয়েও যাচ্ছে যখন-তখন। কখনও তিন ঘণ্টা, কখনও পাঁচ ঘণ্টা। জিজ্ঞেস করলেও সদুত্তর মেলে না। মুচকি হেসে বলে, "এখন চলছে ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ। বাসমতী চাল ঘেঁটে দেখছি কাঁকর মেলে কিনা।" এরকম হেঁয়ালিভরা জবাব শুনলে আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়?

বৃহস্পতিবার সকালে মিতিনের কিঞ্চিৎ ভাবান্তর দেখা গেল। জলখাবারের টেবিলে টোস্ট চিবোতে-চিবোতে বলল, "এবার তো রণক্ষেত্রে নেমে পড়তে হয় রে টুপুর।"

মাসির কাছে ক'দিন পাত্তা না পেয়ে টুপুর মনে-মনে বেশ আহত ছিল। অভিমানী সুরে বলল, "কেন? পাঁজিতে বুঝি এবার শুভক্ষণ বেরিয়েছে?"

"অনেকটা তাই," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "সাইমনের যাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলাম। কাল সন্ধেবেলার ফ্লাইটে তিনি সপরিবার ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন।"

"তোমার এনকোয়ারির সঙ্গে সাইমনের কী সম্পর্ক?"

"কিছুই না। তবে মিস্টার যোশুয়া নিষেধ করেছিলেন কিনা। তাঁর ছেলে চাইছিলেন না শোকের সময়ে এসব তদন্ত-টদন্ত হোক," মিতিন ডিমসেদ্ধ ভেঙে মুখে পুরল, "একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে।"

"কী রকম?"

"আমিও খানিকটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নিলাম।"

"যেমন?"

"যতীনের সম্পর্কে খানিকটা খোঁজখবর নিলাম।"

"কী জানলে?"

"ও চাকরি করছে এক বছরেরও কম। ডেভিড আর র‍্যাচেল ছেলের কাছ থেকে ফেরার পর যতীন মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছে।"

"তো?"

"তিনটে মৃত্যুর সময়েই যতীন মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে মজুত। সুতরাং ফাউল প্লে যদি কিছু ঘটে থাকে, সে তার সাক্ষীও বটে, সাসপেক্টও বটে। তারপর ধর প্রোফেসর, ডাক্তার, শ্যামচাঁদ সকলের সম্পর্কেই কিছু-কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি।"

"কী রকম? কী রকম?"

"ছটফট করছিস কেন। সময় হলেই জানতে পারবি। শুধু শুনে রাখ তিনজনের কেউই নিখাদ ভালমানুষ নন।"

পার্থ নীরবে খাচ্ছিল। খেতে-খেতেই খবরের কাগজের শব্দজব্দে ব্যস্ত। পুটুস করে বলে উঠল, "ওরকম ভাসা-ভাসা কিছু ইনফরমেশন আমিও দিতে পারি।"

"তাই বুঝি?"

"ইয়েস ম্যাডাম টিকটিকি। যেমন ধরো, কলকাতার ইহুদি সমাজে একটা চালু গুজব আছে। মাটুকদের যে কী ধনরত্ন আছে, তা নাকি মাটুকরা নিজেরাই জানে না।"

"কে বলল তোমায়? কোনও ইহুদির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ নাকি?"

"সরি। কলকাতার কোনও ইহুদিরই আমার বন্ধু হওয়ার বয়স নেই। সকলেই সত্তরের ওপারে। মাত্র এক পিসেরই বয়সটা কম। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ সে কে?"

"নাথান?" টুপুর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, "যে কবরখানাটা পাহারা দেয়?"

"ওকে অত সামান্য ভাবিস না। ও কলকাতার সমস্ত ইহুদি পরিবারেরই কেয়ারটেকার। তাদের বিপদেআপদে ডাক পেলে অমনি ছুটে যায়। আর কেউ মারা গেলে সমাধি দেওয়া পর্যন্ত সব দায়িত্ব ওর কাঁধে। নাথানের বাবা-মা মারা গিয়েছেন, দাদা-দিদিরা সব চলে গিয়েছে ইজরায়েলে, ও একা কলকাতার ইহুদিদের জন্য পড়ে আছে। সব ইহুদি পরিবারই ওকে কিছু-কিছু মাসোহারা দেয়, তাতেই ওর চলে কোনও মতে। পার্থ হাতের কাগজখানা সরিয়ে রাখল। মুখে একটা ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে বলল, "কাল বিকেলে গিয়েছিলাম নারকেলডাঙায়। নাথানের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছি। দেখলাম, ও এখানকার সব ইহুদি পরিবারেরই হাঁড়ির খবর রাখে। নাথানই আমায় বলল, আব্রাহাম মাটুকের ওই বাড়িতে গুপ্তধন থাকা মোটেই আশ্চর্যের নয়।"

"তুমিও তা হলে এখন ব্যাপারটা বিশ্বাস করছ?"

"ইয়েস। তবে আর একটা কথাও বলল নাথান। শুধু আব্রাহাম নন, তাঁর বাপ-ঠাকুরদারাও কোনও কালে গুপ্তধন খোঁজার চেষ্টা করেননি। ইহুদিদের ধর্মে নাকি বলে, পরিশ্রম করে যেটা পাবে, সেটুকুই তোমার প্রাপ্য। পূর্বপুরুষরা লোকচক্ষুর আড়ালে যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকেন, তবে ধরে নিতে হবে জিহোভা চান না ওটা কেউ পাক।"

"এবার আমি তোমাকে কিছু জানাই?" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "যাঁর সুবাদে মাটুকদের আর্থিক প্রতিপত্তি, সেই শ্যালোম কোহেন শুধু বাণিজ্যই করতেন না। আর পাঁচটা ইহুদিদের মতো তাঁর সুদের ব্যবসাও ছিল। কারবারটা শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও চলত। এক আফগান তাঁর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল। সেই আফগান ছিল অনেক খনির মালিক। এখন যেখানে আফগানিস্তান-তাজিকিস্তানের বর্ডার, সেখানেই বদখশান প্রদেশে ছিল খনিগুলো। দামি-দামি পাথর মিলত বদখশানের খনিতে। সেই আফগানটি ধার শোধ করার সময় কোহেনকে সুদের বদলে দিয়েছিল এক বিশাল সাইজের চুনি। অতএব কোহেনের ছোট জামাইয়ের পরিবারে ওই চুনিটি থাকাও মোটেই আশ্চর্যের নয়।"

টুপুরের চোখ চকচক করে উঠল, "তা হলে কি আমরা সেই চুনি উদ্ধারে নামব এবার?"

"ওটা পরে ভাবব। আপাতত আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য, তিনটে মৃত্যুর কারণ খোঁজা।" চা রেখে গিয়েছে আরতি। মিতিন কাপে চুমুক দিল, "এখন ফের সেই কাজই শুরু হবে।"

"মৃত্যুগুলো যে স্বাভাবিক নয়, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?"

"আগে খরগোশগুলোকে তো সংগ্রহ করি। তারপর দেখা যাক জুড়ে ঘোড়া হয়, না গাধা।"

"অর্থাৎ এখন চলবে ডেটা কালেকশন, তাই তো?" টুপুর উৎসুক চোখে তাকাল, "তা হলে আজ আবার আমরা ডেভিডসাহেবের বাড়ি যাচ্ছি?"

"তার আগে একবার শ্যামচাঁদ অগ্রবালের সঙ্গে মোলাকাত হওয়া দরকার।"

"কেন?"

"ধর, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাল ভাবে আলাপ জমানো। সেদিন কবরখানায় তো দু'টো- একটার বেশি কথা হয়নি।"

মিতিনমাসির কিছু যে একটা উদ্দেশ্য আছে, বুঝতে অসুবিধে হয়

না। টুপুর আর খোঁচাল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, "কখন বেরোচ্ছি আমরা?"

"দুপুরে। খাওয়া-দাওয়ার পরে সরাসরি ওঁর বাড়িতেই যাব।"

শ্যামচাঁদ অগ্রবালের নিবাসটি একেবারে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের উপরে। পুরনো এক পাঁচতলা বাড়ির গোটা দোতলাটা জুড়ে থাকেন শ্যামচাঁদ। গিয়ে বেল বাজাতেই দরজা খুললেন এক বয়স্কা মহিলা। মিতিন ফোন করে দিয়েছিল, মহিলা পরিচয় জেনে নিয়ে সামনের ঘরখানাতেই মাসি-বোনঝিকে বসিয়ে চলে গেলেন অন্দরে।

ঘরখানা মোটেই দেখার মতো নয়। ক্যাটকেটে সবুজ দেওয়াল, দামি-দামি আসবাব, কিন্তু সেগুলো রাখার কোনও ছিরিছাঁদ নেই, মাথার উপর পুরনো ফ্যানখানার যথেষ্ট বিবর্ণ দশা। একদম বড় রাস্তার উপর হওয়া সত্ত্বেও এই ভরদুপুরেও কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার। শ্যামচাঁদ যে এক ধনী মানুষ, ঘরখানা দেখে আন্দাজ করা কঠিন।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর দর্শন মিলল বছর সত্তরের মানুষটির। পরনে ধুতি-ফতুয়া। হাতে চৌকো মতো স্টিলের পানের ডিবে।

সোফায় বসতে-বসতে শ্যামচাঁদ বললেন, "হঠাৎ আমাকে কেন জরুরত পড়ল ম্যাডাম?"

মিতিন হেসে বলল, "জানেন নিশ্চয়ই, ডেভিডসাহেব আমাকে কী কাজে লাগিয়েছেন?"

"শুনেছি। লেকিন আমি কীভাবে আপনাকে মদত করতে পারি?"

"আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার জবাব দিলেই চলবে। তার বেশি আর কিছু দরকার নেই।"

"বহুত আচ্ছা, বলুন কী জানতে চান?"

"আপনার কী মনে হয়, পরপর তিনটে মৃত্যু হওয়াটা খুব স্বাভাবিক? না ডালমে কুছ কালা আছে?"

"ফালতু-ফালতু ওইস্যা ভাবব কেন? আমি তো কোনও কারণ দেখি না।"

"একটা কারণ কিন্তু এক্ষুনি বলতে পারি মিস্টার অগ্রবাল। বাড়ির লোকেরা পরপর এভাবে মারা গেলে ডেভিড সাহেব এ দেশ থেকে পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হবেন। তখন সস্তায় জমি-বাড়িটা হাতিয়ে সেখানে পেল্লাই কিছু তৈরি করা এবং বিপুল মুনাফা অর্জন।"

"কী যে বলেন ম্যাডাম? এই কারণে কেউ কারওর প্রাণ নিতে পারে?"

"পারে বইকী মিস্টার অগ্রবাল। আমিই তো একটা ঘটনা জানি। কলকাতারই এক নামী ডেভেলপার আলিপুরে একটা জমির দখল নিতে চাইছিল। সেখানে আদ্যিকালের এক বাড়িতে বাস করতেন একজন বৃদ্ধা। তিনি কিছুতেই বিক্রি করতে রাজি হচ্ছিলেন না। হঠাৎই তাঁকে একদিন বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই ডেভেলপারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা করে বৃদ্ধার নাতি। অনেক কায়দাকানুন করে ডেভেলপার কেসটিকে ধামাচাপা দেয়। তবে সে আর প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবসায় থাকেনি। ছেলেদের হাতে বিজনেস ছেড়ে দিয়ে সে এখন শুধু উপদেষ্টার ভূমিকায় আছে," মিতিন ঝুঁকল একটু। চোখ সরু করে বলল, "আপনি তো ওই লাইনেই ছিলেন। চেনেন নাকি ডেভেলপারটিকে?"

অলস মেজাজে সোফায় উপবিষ্ট শ্যামচাঁদের মুখ কালো হয়ে গিয়েছে সহসা। নার্ভাস গলায় বললেন, "তার সঙ্গে এই মৃত্যুগুলোর কী সম্পর্ক?"

"আছে কিনা কে বলতে পারে?"

"ওটা ফল্‌স কেস ছিল। আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

"আবার জড়িয়ে যাবেন। কারণ, আপনি একাধিকবার মার্কুইস স্ট্রিটের জমি-বাড়ি কিনতে চেয়েছেন?"

"বিশ্বাস করুন, সিরিয়াসলি কিছু বলিনি। ওটা স্রেফ কথার কথা। আব্রাহাম আমার পুরনো বন্ধু, তাই জাস্ট আলগা ভাবে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম।"

"সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ। আপনি কিনতে আগ্রহী ছিলেন, তারপর একজন-একজন করে মারা যাচ্ছেন। অতএব সন্দেহের একটা তির আপনার দিকে যায় বইকী মিস্টার অগ্রবাল।"

শ্যামচাঁদের মুখখানা চুপসে-মুপসে এতটুকু। গলা দিয়ে আর স্বর ফুটছে না।

মিতিন ঠান্ডা গলায় বলল, "তা হলে মিস্টার অগ্রবাল, এবার যে প্রশ্নগুলো করব তার ঠিক-ঠিক উত্তর আমায় দেবেন তো?"

"বলুন না কী জানতে চান," শ্যামচাঁদের গলা মাখনের মতো নরম, "আমি তো আপনাকে কো-অপারেটই করতে চাই।"

"ডেভিড যোশুয়ার সঙ্গে আপনার কদ্দিনের পরিচয়?"

"আব্রাহামের সূত্রে অনেক বছর ধরেই চেনাজানা ছিল। অন্তত বছর পনেরো। তবে ডেভিড মার্কুইস স্ট্রিটে পাকাপাকি চলে আসার পর থেকে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। তাও ধরুন, প্রায় তিন বছর হল।"

"পুরোপুরি সত্যি কিন্তু বললেন না। ডেভিডসাহেবের সঙ্গে তিন বছরের বেশি সময় ধরেই আপনার ঘনিষ্ঠতা। কারণ, তাঁর এজরা স্ট্রিটের বাড়ি আপনার অগ্রবাল কনস্ট্রাকশনই কিনেছে এবং সেখানে একটি শপিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে।"

শ্যামচাঁদের মুখ পলকে রক্তশূন্য। আমতা-আমতা করে বললেন, "ওই আর কী, তিন বছরের বেশি, মোটামুটি চার বছর।"

"কী দামে কিনেছিলেন?"

"দু' কোটি।"

"মাত্র?"

"ওঁর বাড়িতে অনেক টেনেন্ট ছিল। তাঁদেরও বহুত রুপিয়া দিতে হয়েছে।"

"ভয় দেখিয়ে তাঁদের তোলেননি নিশ্চয়ই? মস্তান-টস্তান লাগাননি?"

"ছি ছি, কী যে বলেন ম্যাডাম! আমি ওরকম আদমি নই। আমি বহুত শান্তিপ্রিয় আছি। এখন তো কারবার থেকেও মন উঠিয়ে নিয়েছি। সচ বাত।"

"সত্যি হলেই ভাল। তা মিস্টার আব্রাহামের সঙ্গে তো আপনার কারবারের সূত্রেই যোগাযোগ হয়েছিল, তাই না?"

"হাঁ। বহুত সাল পহেলে। বিশ-বাইশ বরস তো হবেই। আগে একটা পার্টনারশিপ ফার্ম ছিল, তখন সবে নিজের কোম্পানি খুলেছি। আব্রাহাম তখন বহুতবার আমাকে লোন দিয়েছেন। ইন্টারেস্ট বেশি নিতেন, লেকিন তুরন্ত টাকা মিলত ওঁর কাছ থেকে। যে-কোনও অ্যামাউন্ট। বিশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ, এক ক্রোর, যা আমি চাইতাম।"

"তা সেই সুদের কারবারীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়ে গেল?"

"একদিনে হয়নি। ধীরে-ধীরে হল। বহুত সাচ্চা ইনসান ছিল তো। হকের পাওনা ছাড়ত না, তবে আমাকে বিজনেসে বুদ্ধি-টুদ্ধি দিত। অনেক পড়াশোনা ছিল, আচ্ছা পিয়ানো বাজাত। ওর মউত-এ আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।"

"মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর রাতটা আপনার মনে আছে?"

"জরুর। মাসটা ছিল সেপ্টেম্বর। সেদিন ওদের বাড়িতে নিউ ইয়ার্সের পার্টি চলছিল।"

টুপুর বলে উঠল, "সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়ার্সের পার্টি?"

"ইহুদিদের ক্যালেন্ডার একেবারে আলাদা রে টুপুর," মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "শুরু হয়েছে খ্রিস্টাব্দের তিন হাজার সাতশো ষাট বছর আগে থেকে। মাসগুলোর নামও অন্যরকম। ইংরেজি বা রোমান প্যাটার্নের নয়। আরবি ধাঁচের।"

"ঠিক বলেছেন ম্যাডাম। নিউ ইয়ারকে ওরা বলে 'রোস হাসান্না'। দু' দিন ধরে চলে উৎসব। তা সেটা ছিল শেষ দিন। ক্যাথলিন আর র‍্যাচেল দুই মেমসাহেব আচ্ছা-আচ্ছা খানা বানিয়েছিল। কেক আইসক্রিম...। আমার জন্য স্পেশ্যাল নিরামিষও ছিল। তো হল কী, ওদের ভাষায় গান-টান হল, আব্রাহাম বড়িয়া পিয়ানো বাজাল, আঙুর আর বেদানার শরবত খেলাম সবাই। শেষে আইসক্রিম খেতে গিয়ে আব্রাহামের গায়ে খানিকটা পড়ে গেল। নয়া ড্রেস খারাপ হয়ে গেল বলে আব্রাহামের কী মন খারাপ, আমরা তাই নিয়ে একটু হাসাহাসি করলাম। তারপর যাওয়ার সময় মিসেস আব্রাহাম আমাদের সবাইকে

একটা করে গিফ্‌ট দিলেন। আমি পেয়েছিলাম একটা কাঠের উট। ডাক্তার পেল চকোলেটের বাক্স। সেনসাহেবকে বোধ হয় কিতাব-টিতাব...।"

"তারপর?"

"পার্টি খতম হল রাত দশটায়।"

"মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর খবরটা পেলেন কখন?"

"সেই রাতেই। বারোটা, সাড়ে বারোটায়।"

"কে জানিয়েছিলেন? মিস্টার যোশুয়া?"

"না। ডাক্তার। ডক্টর সামন্ত।"

"তখনই কি পোস্টমর্টেমের সিদ্ধান্ত হয়েছিল?"

"তেমন তো কিছু বলেনি ডাক্তার। পরদিন ভোরবেলা গিয়ে শুনলাম বডি পোস্টমর্টেমে পাঠানো হচ্ছে। ক্যাথলিন মেমসাহেবের বুঝি আপত্তি ছিল, তবু ডেভিডের জোরাজুরিতে...। ডাক্তারও তো ডেভিডের ইচ্ছেয় সায় দিয়ে রিপোর্ট লিখল।"

"হুম," মিতিন ঘাড় দোলাল, "মিসেস আব্রাহামও তো এক পরবের দিন মারা গেলেন?"

"হাঁ। সেদিনও ওদের কী একটা যেন ছিল। ওই রাত্তিরে ওরা এক আজব কিসিমের কেক বানায়। পোস্ত-টোস্ত দিয়ে।"

"এটা কোন মাসে হয়েছিল?"

"জানুয়ারিতে। মাত্র ক' মাস আগে আব্রাহাম মারা গেছে তো, তাই খুব একটা আমোদ-আহ্লাদ হয়নি। আব্রাহামের উদ্দেশে প্রার্থনাও করলাম সেদিন। আমি অবশ্য সেদিন বেশিক্ষণ ছিলাম না, তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম। সকালে ডেভিডের ফোন পেয়ে মিসেস আব্রাহামের খবরটা জানলাম।"

"মিসেস আব্রাহামের তো পোস্টমর্টেম হয়নি?"

"না ম্যাডাম। তবে সেবারও ডেভিডের খুব ইচ্ছে ছিল পোস্টমর্টেম করানোর। কেউ রাজি হয়নি বলে নাকি চেপে গিয়েছিল।"

"মিস্টার আব্রাহামের সময়ে কেউ ময়নাতদন্তে আপত্তি করেনি?"

"করেছিল বইকী। ওদের সমাজের কেউই চায়নি আব্রাহামের কাটাছেঁড়া হোক।"

"তা হলে মিসেস আব্রাহামের বেলায় কেন সেভাবে জোর করলেন না মিস্টার ডেভিড?"

"আমি কী করে বলব? ওর মনে কী ছিল আমি কী করে জানব?"

"হুম," অনেকক্ষণ ঝুঁকে বসে ছিল মিতিন, এবার সোফায় হেলান দিয়ে বলল, "আচ্ছা শ্যামচাঁদজি, প্রোফেসর আর ডাক্তারকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয়?"

"ডাক্তার বিলকুল সিধাসাদা। তবে প্রোফেসর একটু নাকউঁচু আছে। আমার পড়ালিখা কম বলে আমায় নিয়ে কভি-কভি ঠাট্টা ভি করেন। আমি অবশ্য গায়ে মাখি না।"

"আপনি কি জানেন, মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িতে গুপ্তধন আছে?"

"সিডিতে ডেভিডের ইন্টারভিউটা শুনে জেনেছি।"

"সেটা কোন মাসে?"

"ডেভিড যেন কবে লন্ডন থেকে ফিরল? হাঁ, আগের বছর জুলাই-অগস্ট হবে।"

"মিস্টার আব্রাহামকে তো আপনি জমি-বাড়ি বিক্রির কথা বলেছিলেন। মিস্টার ডেভিড যোশুয়াকে ওরকম কোনও প্রস্তাব দিয়েছিলেন নাকি?"

"কভি নেহি। তবে বহুত প্রোমোটারের ওই মকানের উপর লোভ আছে। আমি জানি," বলেই শ্যামচাঁদ একটু গলা নামালেন, "দেখুন ম্যাডাম, ওই তিনজনের মউত নিয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু একটা বাত আমার মনে খচখচ করছে।"

"কী?"

"প্রোফেসরসাব যে লড়কাটাকে কাজের জন্য আব্রাহামকে দিয়েছিলেন, সে আসার পর থেকেই কিন্তু এক-এক করে তিনজন মারা গেল। জানি না, এ কোইনসিডেন্ট ভি হতে পারে!"

"অর্থাৎ আপনি বলছেন প্রোফেসরসাহেবই হয়তো কিছু...।"

"আমি কুছু বলছি না। যা মনে হল তাই বলে দিলাম। এখন আপনি ভাবুন এতে কোনও গড়বড় আছে কিনা।"

শ্যামচাঁদের ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি। মিতিন আর টুপুর চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

॥ ৮ ॥

বেলা চারটে বাজে। জ্যৈষ্ঠের সূর্য এখনও দারুণ প্রখর। শ্যামচাঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির এসিটা চালিয়ে দিয়েছিল মিতিন, তাপটা তাই সেভাবে টের পায়নি টুপুর। মার্কুইস স্ট্রিটে পৌঁছে দরজা খুলে নামতেই গায়ে যেন আগুনের হল্‌কা। ঝটিতি গাড়িবারান্দার নীচে এসে তবে শান্তি। আদ্যিকালের কাঠামো তো, ছায়াতে শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

বেল বাজাতেই যতীন। খানিকটা যেন অবাক মুখেই বলল, "এখন আপনারা?"

মিতিন কেজো গলায় বলল, "এলাম। দরকার আছে।"

"ও। আসলে সাহেবের তো এখন শোকের সময় চলছে, বাইরের লোক তো বড় একটা আসছে না।"

"তাই বুঝি? তা সাহেব কোথায়?"

"উপরে।"

"তা হলে তো তাঁকে একবার ডাকতে হবে।"

"বসুন। খবর দিচ্ছি।"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নীচে নেমেছেন ডেভিড। তবে একা নন, সঙ্গে সারা আর বেঞ্জামিন।

দাড়ি-গোঁফ ছাঁটা প্রবীণ বেঞ্জামিনের পরনে ইহুদি পোশাক। সারার অঙ্গে কালো গাউন। আজও কারপেটে আসন গ্রহণ করলেন তিনজনে। দেখাদেখি টুপুর-মিতিনও। ডেভিডের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে। বোঝাই যায়, এখনও র‍্যাচেলের মৃত্যুশোকটা সামলে উঠতে পারেননি।

কাতর স্বরে ডেভিড জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি তদন্ত শুরু করেছেন?"

"এই তো...সবে মাত্র...।"

"আর কি তার প্রয়োজন আছে? বেঞ্জামিন বলছিল...।"

"শুধু আমি নই," বেঞ্জামিনের ঘড়ঘড়ে স্বর বেজে উঠল, "আমি আর সারা দু'জনেই বোঝাচ্ছিলাম ডেভিডকে। এভাবে আপনজনদের চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখের। কিন্তু মৃত্যুগুলো নিয়ে অনর্থক শোরগোল তুলেই বা কী লাভ? বরং জিহোভার কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন শোক সইবার শক্তি দেন।"

সারা নরম গলায় বললেন, "সেই সঙ্গে র‍্যাচেলের আত্মাও শান্তি পায়।"

"আমি আর একটা পরামর্শও দিচ্ছিলাম ম্যাডাম," বেঞ্জামিন বললেন, "র‍্যাচেল যতদিন ছিল, ততদিন কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ডেভিডের পক্ষে এখন তো আর কলকাতায় একা-একা থাকা সম্ভব নয়। এখন ওর শোকের প্রথম পর্ব চলছে। আমরাও রোজ আসছি। এখন তো বাড়িতে রান্নাবান্নার নিয়ম নেই, সারা খাবার-দাবারও তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরাও তো বুড়োবুড়ি, আমাদের পক্ষে এভাবে চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। এর পর হয়তো নিয়মিত আসতেই পারব না। তখন কে ওর দেখাশোনা করবে? শুধুমাত্র যতীনের ভরসায় এখানে পড়ে থাকা কি ওর পক্ষে সম্ভব? আপনিই বলুন?"

সারা বলে উঠলেন, "তাই বেঞ্জামিন বলছিল, আর কোনও ওজরআপত্তি নয়। ডেভিডের এখনই পাকাপাকি ভাবে লন্ডন চলে যাওয়াটাই সমীচীন।"

মিতিনের ভুরুতে পল্‌কা ভাঁজ, "আর এই জমি-বাড়ির কী হবে?"

"সে ব্যাপারটাও ভেবেছি। বাড়ি-জমি বিক্রি নিয়ে এখন টেনশন করার কোনও প্রয়োজন নেই," বেঞ্জামিন বললেন, "আপাতত আমিই দেখাশোনা করব। যদি ডেভিড পারমিশন দেয়, তা হলে এদিকে

কোনও প্রোমোটার-টোমোটারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারি। তারা না হয় ই-মেলে সাইমনের সঙ্গে দরদাম স্থির করবে। তারপর একবার বাপ-ছেলে একসঙ্গে এসে ব্যাপারটা চূড়ান্ত করে চলে যাক।"

"ভালই তো প্রস্তাবটা," মিতিন আড়চোখে দেখল ডেভিডকে, "তা মিস্টার যোশুয়া কি রাজি?"

"নিমরাজি মতো হয়েছে।"

"ও। তা কবে চলে যাবেন ঠিক করেছেন কিছু?"

"আগামী রোববার শোকের প্রথম পর্বটা চুকবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তিরিশ দিন বা এক বছরের রীতিনিয়ম নয় লন্ডনেই পালন করবে।"

"অতি উত্তম," মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "তবে যতদিন উনি আছেন, ততদিন একটু ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি।"

সারা বা বেঞ্জামিন কেউ যেন বিশেষ প্রীত হলেন না। গোমড়া মুখে সারা বললেন, "কী তদন্ত করবেন? করার আছেটা কী?"

"তেমন কিছু নয়। জাস্ট কিছু খোঁজখবর আর ক'টা প্রশ্নটশ্ন। মিতিন গলা ঝাড়ল, "যেমন ধরুন, তিনটে মৃত্যুর দিনই তো আপনারা ছিলেন, কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে পড়েছিল কি?"

"একেবারেই না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনটেই হার্ট অ্যাটাকের কেস।"

"ব্যস, ওইটুকুই? শুনলাম, মিস্টার আব্রাহামের মৃত্যুর দিন তার গায়ে হঠাৎ আইসক্রিম পড়ে গিয়েছিল? র‍্যাচেল ম্যাডামের গায়ে পড়েছিল লাল পানীয়ের গ্লাস? ভেঙে চুরচুর হয়ে গিয়েছিল?"

"পার্টিতে তো ওরকম হরবখতই ঘটে। ক্যাথলিনের গায়েও তো ফলের রস পড়েছিল। তারপর দিব্যি গটগটিয়ে উপরে গেল, ড্রেস বদলাল। যখন ফের সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে, তখনই দুম করে...।"

"ঘটনাটা কতক্ষণ পর ঘটেছিল স্মরণে আছে কি? আই মিন, গায়ে ফলের রস পড়ার কতক্ষণ পর হার্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল?"

"পনেরো-বিশ মিনিট তো হবেই। কিংবা আরও বেশি। ধরুন প্রায় আধ ঘণ্টা," বেঞ্জামিন বিরক্ত স্বরে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? আর জেনেই বা কী হবে আপনার?"

জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "উনি কি গায়ে ফলের রস মাখা অবস্থাতেই ড্রেস বদলাতে চলে গিয়েছিলেন?"

"আজব প্রশ্ন!" এবার সারা যেন একটু ঝেঁঝে উঠলেন, "এমনটা হয় নাকি? আমি মুছে দিয়েছিলাম।"

"আপনার রুমালে?

"না। কে একজন যেন দিল।"

"কে?"

"সে কি আর মনে আছে? থাকা সম্ভব?"

"একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন।"

"সরি," সারার কণ্ঠে এবার বিদ্রুপ, "চার মাস পরে আপনাকে বলতে হবে জানলে নিশ্চয়ই মনে গেঁথে রাখতাম। কিন্তু এখন তো সেটা আর পারব না।"

মিতিন চটল না। শান্ত ভাবেই বলল, "তবু একবার ভেবে দেখুন। প্রোফেসরসাহেব? ডাক্তারবাবু? মিস্টার অগ্রবাল? কিংবা যতীন?"

"যে কেউই হতে পারে। বেঞ্জামিন বা ডেভিড হতেই বা আপত্তি কী!" সারার বলিরেখা ভরা কপালে আরও ভাঁজ বাড়ল, "ওই রুমালটা কি খুবই রহস্যময়?"

মিতিন কোনও উত্তর দিল না। বেঞ্জামিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "মিস্টার আব্রাহাম আর মিস্টার যোশুয়ার লোকাল বন্ধুদের আপনারা তো বহুকাল চেনেন, তাই না?"

"প্রোফেসরসাহেব আর মিস্টার অগ্রবালের সঙ্গে অনেক বছরেরই আলাপ। ডাক্তার তো এ বাড়িতে হালে আসছে। অবশ্য তার আগেই ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।"

"কীভাবে?"

"আমাদেরই সমাজের আর একজনের বাড়িতে। এলিয়াস আসের। তার বোধ হয় মাসখানেক পর ওকে এই বাড়িতে দেখলাম।"

"ও। তা এঁরা লোক কেমন?"

"কেউই খারাপ নয়। দুনিয়ার সকলেই ভাল। শুধু মিস্টার অগ্রবাল একটু ধান্দাবাজ টাইপ। শুনেছি নিজের স্বার্থে খারাপ কাজ করতে পারেন। তবে...," বেঞ্জামিন সামান্য দম নিলেন, "আব্রাহাম বা ডেভিডের সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা তেমন নয়। এখানে তো খোলা মনেই মেলামেশা করেন। অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়।"

ডেভিড অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে। সামনে যে এত কথা হচ্ছে, কিছুই যেন তাঁর কানে যাচ্ছে না। হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বললেন, "এসব প্রসঙ্গ আজ থাক না ম্যাডাম। আমার আর ভাল লাগছে না।"

"বেশ। থাক তবে," মিতিন অল্প কাঁধ ঝাঁকাল। মৃদু স্বরে বলল, "আপনার কাছে অন্য একটা রিকোয়েস্ট ছিল মিস্টার যোশুয়া।"

"বলুন?"

"আপনাদের এই বাড়িটা প্রথম দিন থেকে আমায় খুব টানছে। যদি অনুগ্রহ করে একটু ঘুরে দেখার অনুমতি দেন। বিশেষ করে দোতলার ঘরগুলো।"

ডেভিড ভাবলেন ক্ষণেক। তারপর বললেন, "চলুন সঙ্গে।"

পায়ে-পায়ে দোতলায় উঠল মিতিন আর টুপুর। ডেভিড-সারা-বেঞ্জামিনের পিছু-পিছু। প্রথমেই সেই ঘর, যেখানে মারা গিয়েছিলেন র‍্যাচেল। চেয়ার, টেবিল, টিভি, আলমারি, খাট, ড্রেসিংটেবিল সর্বত্রই চোখ বোলাল মিতিন। তারপর এসেছে পাশের ঘরে। এই কামরাখানা তেমন বড় নয়। তবে পুরনো আসবাবে মোটামুটি সুসজ্জিত। এ ঘরেই এখন বাস করছেন ডেভিড। আরও দু'খানা ঘর আছে দোতলায়। তালাবন্ধ অবস্থায়।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "ঘর দু'টো কি বন্ধই থাকে?"

ডেভিড বললেন, "হ্যাঁ। ওগুলো আব্রাহাম আর ক্যাথলিনের ঘর। ক্যাথলিনের মৃত্যুর পর আমি দু'টোতেই তালা মেরে দিয়েছি।"

"আর একদমই খোলা হয় না?"

"র‍্যাচেল খুলত। প্রতি সপ্তাহে একদিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাফসুতরো করাত যতীনকে দিয়ে। ঘর দু'টো কি দেখতে চান?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়...।"

কোমর থেকে চাবির ভারী গোছা বের করলেন ডেভিড। খুলছেন বাঁ দিকের প্যাসেজের তৃতীয় ঘরখানা। মোটামুটি বড়ই। সাজানো-গোছানো। যত্নআত্তির ছাপ বেশ স্পষ্ট। মাথার উপর ছোট একটা ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে অজস্র বিবর্ণ হয়ে আসা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ। বিশাল পালঙ্ক, আলমারি, পাথর বসানো ড্রেসিংটেবিল, ফ্রেমে বসানো দোলআয়না, সবেতেই কেমন মনকেমন করা প্রাচীন-প্রাচীন গন্ধ।

প্যাসেজের শেষ প্রান্তের ঘরটিতে ঢুকে টুপুরের চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। কী পেল্লাই সাইজ রে বাবা! নীচের ড্রয়িংহলটার চেয়েও বড়। আরও আশ্চর্য, অত বড় ঘরে আসবাব প্রায় নেই বললেই চলে। ঘরের প্রায় মধ্যিখান দিয়ে তিন-তিনখানা সরু থাম উঠে গিয়েছে সিলিং পর্যন্ত। তাদের গায়ে বিচিত্র কারুকাজ। থামের ওপারে দু' খানা ভারী আরামকেদারা, একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, দেওয়ালে গাঁথা কাচের আলমারিতে বই, বই, রাশি-রাশি বই।

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "এত বই? এটা লাইব্রেরি নাকি?"

"ঠিক ধরেছ," ডেভিড বললেন, "এ বাড়ি যিনি তৈরি করেছিলেন, এটা ছিল তাঁরই লাইব্রেরি।"

"কে তিনি? কী নাম?"

"শ্যালোম কোহেনের নাতি। স্যামুয়েল এজরা মাটুক। আব্রাহামের ঠাকুরদার বাবা। আব্রাহাম তার প্রপিতামহের ধারাটা বজায় রেখেছিল, এ ঘরেই কাটাত দিনের বেশির ভাগ সময়টা। প্রোফেসর এলে তো রীতিমত লেখাপড়ার আড্ডা জমে যেত এ ঘরে।

মিতিন কাছে গিয়ে থামগুলো দেখছিল। ঘুরে জিজ্ঞেস করল, "থামের গায়ে ভারী সুন্দর ডিজাইন তো?"

"না-না, ওগুলো ডিজাইন নয়," ডেভিড প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওগুলো আমাদের ধর্মীয় লিপি। বাঁ দিকের থামে লেখা আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। মধ্যিখানে আমাদের আদি ধর্মগ্রন্থ

তালমুদ। আর একেবারে ডান দিকেরটায় রয়েছে আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন 'টোরা'। সবই আমাদের পবিত্র হিব্রু ভাষায় লেখা।"

বেঞ্জামিন বললেন, "স্যামুয়েল খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন তো, তাই ঘরেই ধর্মগ্রন্থ পাঠের বন্দোবস্ত করেছিলেন।"

ডেভিড বললেন, "শুনেছি সিরিয়া থেকে একজন লিপিকার আনিয়েছিলেন। ঘরের মাঝখানে থাম তিনখানা তুলে তাকে দিয়ে ধর্মগ্রন্থ খোদাই করিয়েছিলেন।"

"তার মানে এটা শুধু লাইব্রেরিই নয়, প্রার্থনার ঘরও বলা যায়," বলতে-বলতে হঠাৎ মিতিন ত্বরিত পায়ে ঘরের দরজায়। বিরস গলায় বলে উঠল, "তুমি এখানে কী করছ যতীন? কিছু বলবে?"

চৌকাঠের ওপারে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা যতীন বেজায় থতমত। মিনমিন করে বলল, "না মানে... জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম আপনারা শরবত-টরবত খাবেন কিনা?"

"ধন্যবাদ। কিছু লাগবে না। তুমি যেতে পার।"

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছে যতীন। সেদিকে দু'-এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে মিতিন আবার ফিরেছে, "এ বাড়িটার বয়স কত হল?"

"দেড়শোর চেয়ে কিছু কম। একশো ছেচল্লিশ।"

আর একবার থাম তিনটে নিরীক্ষণ করে দেওয়ালের বইগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল মিতিন। আলতো হেসে বলল, "সমস্ত বই-ই কি স্যামুয়েলসাহেবের সংগ্রহ?"

"সে তো বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে আব্রাহামও খুব বই-টই কিনত। সেগুলোও এখানে আছে কিনা। ওটা প্রোফেসরসাহেবই বলতে পারবেন। আমি তো খুব একটা পুস্তকপ্রেমী নই। অ্যাকাউন্টস লাইনের লোক, হোটেলের জমাখরচের হিসেব করে-করেই জীবন কেটে গিয়েছে।"

"ও হ্যাঁ, তাও তো বটে," মিতিন আলগা ভাবে বলল, "ঘরখানা দেখে বেশ আনন্দ পেলাম। চলুন, এবার যাওয়া যাক।"

দোতলার রান্নাঘরখানায় একবার উঁকি মেরে নীচে নামল সকলে। হালকা পায়ে একটু ঘুরল একতলাটা। তারপর ডেভিডদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মিতিন আর টুপুর।

বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। পথে অফিসযাত্রীদের থিকথিকে ভিড়। ধীর গতিতে নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল মিতিন। টুপুর আড়ে-আড়ে দেখছিল মাসিকে। ধুরন্ধর শ্যামচাঁদ আর খিটখিটে বেঞ্জামিনের সঙ্গে কথা বলে লাভ হল কি কিছু? নাকি দিনটা বেকার গেল আজ? মাসির মুখ দেখে তো কিছুই ঠাহর করার জো নেই।

টুপুর সতর্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী গো, কী বুঝছ? মিস্টার যোশুয়া তো বোধ হয় আর কেস নিয়ে এগোতে চাইছেন না?"

"অতই সোজা? আর কি পিছনোর জো আছে?"

"কেন নেই?"

"হাঁউ মাঁউ খাঁউ রহস্যের গন্ধ পাঁউ। কী বুঝলি?" টুপুর দু' দিকে মাথা নাড়ল। হেঁয়ালি করে কী যে সুখ পাচ্ছে মিতিনমাসি!

॥ ৯ ॥

রাত্তিরে আর কেসটা নিয়ে মাসির সঙ্গে কথা হল না টুপুরের। বাড়ি ফিরে সন্ধেবেলা পার্থমেসোকে আজকের অভিযানের আনুপূর্বিক বিবরণ শোনাল। সগর্বে নিজস্ব নানান মতামত জাহির করল পার্থমেসো। কিন্তু মিতিন সেদিকে ঘেঁষলই না। সে হঠাৎই কম্পিউটারে বেজায় ব্যস্ত। নৈশাহারের সময়টুকু ছাড়া নিজের খুপরি থেকে বেরলই না। কত রাতে যে শুয়েছে মাসি, তাও জানে না টুপুর।

সকালে এক বিচিত্র কাণ্ড। পার্থ সবে খেয়েদেয়ে নিজের প্রেসে গিয়েছে, ক'দিন বইখাতা নিয়ে বসা হচ্ছে না বলে টুপুর তখন হোমটাস্ক নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত, হঠাৎই ল্যান্ডফোন ঝনঝন।

মিতিন আজও সকাল থেকে কম্পিউটারে। টুপুর গিয়ে রিসিভার তুলেছে। ও প্রান্তে ডেভিডের গলা থরথর, "ম্যাডাম মুখার্জি আছেন?"

উদ্বেগজনক কিছু ঘটেছে আঁচ করে টুপুর বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"ওঁকে এক্ষুনি একটা খবর দেওয়া দরকার। আবার সেই ভূতুড়ে ফোনটা..."

"কী বলেছে আপনাকে?"

"না-না, আমাকে নয়। আমাদের প্রোফেসরসাহেবকে। আর কী আশ্চর্য, ফোনটা আমার ফোন থেকেই গিয়েছে!"

"তাই?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র প্রোফেসরসাহেব আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনিও তো মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছেন না," ডেভিডের গলা কাঁপছে, "আমার খুব নার্ভাস লাগছে। তুমি এক্ষুনি মাসিকে জানিয়ে দাও।"

"নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই।"

ফোনটা রেখেই টুপুর দেখল মিতিনমাসি বেরিয়ে এসেছে গলতা ছেড়ে। উত্তেজিত মুখে তাকে ডেভিডের কথাগুলো জানাল টুপুর। কিন্তু শুনেও মিতিনের কোনও হেলদোল নেই। অলস মেজাজে বসেছে সোফায়।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, "কী গো, তুমি কি কলটাকে পাত্তা দিচ্ছ না?"

"দিচ্ছি তো।"

"তা হলে বসে পড়লে যে বড়? প্রোফেসর সেনের নম্বর তো আছে তোমার কাছে। জিজ্ঞেস করো ব্যাপারটা।"

"ছটোপাটির কী আছে? প্রোফেসর তো পালাচ্ছে না। বরং ফোনটা নিয়ে একটু ভাবি, কেমন?" বলেই মিতিন হেলান দিয়ে চোখ বুজেছে। হতবুদ্ধির মতো মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল টুপুর। ঠোঁট উলটে ঘরেই চলে যাচ্ছিল, ফের ফোনের ঝংকার। এবার ল্যান্ডলাইন নয়, মিতিনের হাতের মোবাইল।

চোখ না খুলেই বোতাম টাপল মিতিন, "হ্যাঁ প্রোফেসর সেন, বলুন।"

বাহা রে বা, ফোনের ওপারে প্রোফেসর সেন স্বয়ং! খুবই হাউমাউ করছেন ভদ্রলোক। কথা বোঝা না গেলেও কণ্ঠস্বরটি শোনা যায়। মিতিন অবশ্য হুঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি, বটে ছাড়া বলছে না কিছু। তবে মাসির শেষ বাক্যে এইটুকু বোধগম্য হল, ভদ্রলোক এখনই আসছেন বাড়িতে।

টুপুর কিছু শুধোবার আগেই মিতিন বলে উঠল, "জানার জন্যে পেট ফুলছে তো?"

"বলার হলে বলো।"

"শোন, ভদ্রলোকের কাছে ফোন গেছে খানিকক্ষণ আগে। দশটা পনেরো নাগাদ। মেয়েলি গলায় কেউ একজন বলেছে, সেভ ডেভিড। টেল হিম টু লিভ কলকাতা।"

"মিস্টার যোশুয়ার নম্বর থেকে? মেয়েলি গলায়?"

"ইয়েস।"

"স্ট্রেঞ্জ! কী করে হয়?"

"অনেক কিছুই হয় রে টুপুর। চুপচাপ খেলা দেখে যা," বলেই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়েছে। ফোন লাগাচ্ছে ডেভিড যোশুয়াকে।

ওপারে সাড়া পেতেই গম্ভীর স্বরে বলল, "ফোন কলের নিউজটা পেয়েছি। দেখছি। এবার আমি আপনাকে ক'টা কথা বলছি, খুব মন দিয়ে শুনুন। আমি জানি, ইহুদিরা শোকের প্রথম সাত দিন কোনও জামাকাপড় কাচাকুচি করে না। সুতরাং র‍্যাচেল ম্যাডাম মৃত্যুর দিন পার্টিতে যে পোশাকটি পরেছিলেন, এখনও নিশ্চয়ই সেটা ধোওয়া হয়নি? আপনি পোশাকটি আলাদা করে রাখুন, আমি আজই গিয়ে নিয়ে আসব। কারণটা আপনি পরে শুনবেন। মনে থাকবে নিশ্চয়ই?"

মিতিন ফোন অফ করতেই টুপুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "তুমি র‍্যাচেল ম্যাডামের ড্রেস দিয়ে কী করবে?"

"মাথা খাটা," মিতিন হালকা হাসল, "বুঝতে পারবি। আর মগজে

ঘিলু না থাকলে গিয়ে অঙ্ক কর।"

টুপুর আরও বেজার। গোমড়া মুখে ঘরে গিয়ে বীজগণিত নিয়ে বসেছে। কিন্তু মন দেবে কী করে? বাইরের ঘর টানছে না?

আধঘণ্টার মধ্যে বেলের আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এল টুপুর। হ্যাঁ, প্রোফেসর হিরণ্ময় সেনই বটে। বয়স্ক লোকটিকে যেন বেশ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে আজ। মিতিন আপ্যায়ন জানাতেই ধপ করে বসে পড়লেন সোফায়। চশমা খুলে কাচ মুছছেন।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?"

"না-না। আপনি তো বলেই দিলেন স্কুলের উলটো দিকের বাড়ি।"

"চা-শরবত কিছু চলবে?"

"না। শুধু এক গ্লাস জল।"

টুপুর জল এনে দিয়েছে। গ্লাসটুকু নিঃশেষ করে একটু বুঝি থিতু হলেন হিরণ্ময়। রুমালে মুখ মুছছেন।

মিতিন বসেছে মুখোমুখি। ঠোঁটে শুকনো হাসি টেনে বলল, "এবার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়েছে মিস্টার যোশুয়া অকারণে ভয় পাননি?"

"তাই তো দেখছি," হিরণ্ময় ঢোক গিললেন, "কিন্তু আমাকে ফোন করা কেন?"

"বোধ হয় দুষ্টু লোকটার ডেভিডের উপর করুণা হয়েছে প্রোফেসর সেন। এই শোকের সময় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে চায় না। তাই হয়তো বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে মিস্টার যোশুয়াকে শাসানোর পন্থা নিয়েছে," মিতিনের স্বর ক্রমশ কঠিন, "এবার নিশ্চয়ই এও বুঝতে পারছেন, মিস্টার আব্রাহাম, ম্যাডাম ক্যাথলিন, ম্যাডাম র‍্যাচেলের মৃত্যু সম্ভবত অস্বাভাবিক?"

"আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আপনি তো মোটেই নরম ধাতের মানুষ নন প্রোফেসর সেন।"

"আচ্ছা, এমন নয় তো, ডেভিডের ফোন থেকে কোনও মহিলা আমায় ফোনটা করেছেন? ডেভিডের অজান্তে?"

"কে করতে পারে?"

"মিসেস বেঞ্জামিন তো ও বাড়িতে সর্বদাই যাওয়া-আসা করেন।"

"সরি প্রোফেসর সেন। সারাম্যাডাম ফোনটা করেনি।"

"কী করে জানলেন?"

"কারণ, মিসেস বেঞ্জামিন আজ ও বাড়িতে যাননি। মিস্টার যোশুয়াকে আমি জিজ্ঞেস করে জেনেছি।"

"তা হলে?"

"এমন নয় তো, মিস্টার যোশুয়ার ল্যান্ডলাইন থেকে আপনার কাছে কোনও ফোনই যায়নি? আপনি বানিয়ে বলছেন?" মিতিন গলার স্বর আরও দৃঢ় করেছে, "আপনার মোবাইলে নম্বরটা আছে?"

"না মানে...ফোনটা তো এসেছিল আমার ল্যান্ড লাইনে... হয়তো কলার আইডি ঘাঁটলে পাওয়া যাবে।"

"অর্থাৎ পরিষ্কার প্রমাণ নেই।"

"কিন্তু আমি মিথ্যে কেন বলব?"

"কারণ, আপনি মানুষটি যে একটু গোলমেলে। মাটুক পরিবারের সঙ্গে যে আপনার এতদিনের মেলামেশা তা তো অকারণে নয়।"

"মানে?"

"নিজের অতীত ইতিহাসটা একটু ভাবুন। আজ থেকে বারো বছর আগে আপনি একটা অভিযানে গিয়েছিলেন। বেশি দূরে নয়, মালদায়। গৌড়ে। আপনার ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে। ওখানে তখন অনেক খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। মাটির নীচ থেকে সুলতানি আমলের বেশ কিছু প্রাচীন মুদ্রাও মিলেছিল। বহুমূল্য সেই মুদ্রাগুলো হঠাৎ খোওয়া যায়। অভিযোগটা আপনার ঘাড়ে চেপেছিল কিন্তু। কিছুই হয়তো প্রমাণ হয়নি, কিন্তু আপনার টিম মেম্বারদের বিশ্বাস, আপনিই সেগুলো সরিয়েছিলেন।"

"বাজে কথা। মিথ্যে অপবাদ।"

"আপনি তা বলতেই পারেন। তবে কিনা আপনার মতো সন্দেহজনক অতীতের একজন মানুষ যখন যেচে একটি ইহুদি পরিবারের সঙ্গে আলাপ জমায়, আর সেই ইহুদি পরিবারটায় যদি গুপ্তধন-টুপ্তধন থাকে, তখন ব্যাপারটা একটু কেমন-কেমন লাগে না?"

"কী বলছেন আপনি? আব্রাহামের সঙ্গে আমার কত বছরের বন্ধুত্ব, ও আমাকে আরবি ভাষা শিখিয়েছে, ওর লাইব্রেরিতে বসে আমরা পড়াশোনা করতাম...।"

"বটে? নিছক জ্ঞানচর্চার কারণেই কি তবে যতীনকে ও বাড়িতে নিয়োগ করিয়েছিলেন? তাও আবার কিনা মিস্টার যোশুয়া গুপ্তধনের কাহিনিটা বিদেশেও শুনিয়ে এলেন তারপর? সেই যতীনও অষ্টপ্রহর সকলের উপর নজর রাখছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে অন্যদের কথা গিলছে এবং আপনার কাছে সেটা পৌঁছে দিচ্ছে," মিতিনের স্বরে মৃদু ধমক, "একটি বর্ণও আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

হিরণ্ময় রীতিমত মিইয়ে গেছেন। আমতা-আমতা করে বললেন, "বিশ্বাস করুন, আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।"

"সে আপনি পুলিশকে বলবেন। কারণ, আপনার দেওয়া লোকটি কাজে যোগ দেওয়ার পরই তিন-তিনজন মানুষ মারা গেলেন তো। ব্যাপারটা কতটা কাকতলীয় পুলিশ তো সেটা জানতে চাইবেই।"

"সর্বনাশ," হিরণ্ময়ের কপালে হাত, "পুলিশ কেস হয়ে গিয়েছে নাকি?"

"না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের," মিতিন চোখ তেরচা করল, "যাক গে, যদি মনে পাপ নাই থাকে, সাফ-সাফ আমার প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। কিছু গোপন করবেন না কিন্তু।"

"প্রশ্নই আসে না। বলুন কী জানতে চান?"

"মৃত্যুর দিন মিস্টার আব্রাহামের গায়ে অনেকটা আইসক্রিম পড়ে গিয়েছিল। কীভাবে?"

আচমকা এ হেন জিজ্ঞাসায় হিরণ্ময় থতমত। তারপর অপ্রতিভ স্বরে বললেন, "সত্যি বলতে কী, দোষটা আমারই ছিল।"

"কীরকম?"

"কারপেটে না কিসে যেন হোঁচট খেয়ে এমন ভাবে আব্রাহামের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, ওঁর পুরো আইসক্রিমটাই...," হিরণ্ময় অপরাধী-অপরাধী মুখ করে বললেন, "অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে মুছেও দিয়েছিলাম।"

"আপনার রুমাল দিয়ে?"

"বের করতে যাচ্ছিলাম। তার আগে কে যেন এগিয়ে দিল।"

"কে? ডেভিড? বেঞ্জামিন? র‍্যাচেল? ডাক্তার? ক্যাথলিন? শ্যামচাঁদ? যতীন?"

"বোধ হয় ডাক্তার। না-না, বোধহয় ডেভিড। নাকি র‍্যাচেলই বোধ হয়...। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"আর এবার র‍্যাচেলম্যাডামের বেলায়? কে রুমাল দিলেন?"

"যতীন তো তোয়ালে এনেছিল। তার আগে অবশ্য দু'-তিনজন মিলে হাত-টাতগুলো মুছে দিচ্ছিল।"

"তাঁরা কারা?"

"ওই তো, সারা, ডাক্তার। তারপর আমিও রুমালটা দিলাম। যতীন তখন ভাঙা কাচগুলো সরাচ্ছিল।"

"মিস্টার অগ্রবাল হাত লাগাননি?"

"দূর দূর, শ্যামচাঁদের ওসব সেন্স আছে নাকি? অফিস বাড়ি-টাড়ি বানিয়ে অনেক পয়সা কামিয়েছে বটে, তবে প্রোমোটার হওয়ার ওর যোগ্যতা নেই।"

"আপনি কি অনেক প্রোমোটারকে চেনেন?"

"দু'-চারজনকে। আমার এক ভাইপোই তো...," বলেও কথাটা গপ করে গিলে নিলেন হিরণ্ময়। সতর্কভাবে বললেন, "তারা কেউই শ্যামচাঁদের মতো হাঙর-কুমির নয়। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ আর্কিটেক্ট, প্রত্যেকেই সভ্যভব্য ব্যবসাদার।"

"হুম, ব্যাপারগুলো মোটামুটি বোঝা গেল," মিতিন ঠোঁট চাপল, "এবার আপনি আসতে পারেন।"

"তা হলে ফোনটার ব্যাপারটা কী হল?" হিরণ্ময়ের স্বরে ইতস্তত ভাব, "ডেভিডের কি তা হলে সত্যিই বিপদ?"

"এক্ষুনি বলা কঠিন। চারপাশে যা চাঁদের হাট নিয়ে বিচরণ করছেন ভদ্রলোক!" মিতিনের স্বরে চোরা হুল, "দেখছি কদ্দূর কী করতে পারি।"

ক্ষুব্ধ মুখে উঠে দাঁড়ালেন হিরণ্ময়। এক পা, এক পা করে দরজার দিকে এগোচ্ছেন। পিছন থেকে মিতিন ডাকল, "এক সেকেন্ড। যতীনের মোবাইল নম্বরটা দিয়ে যান তো।"

হিরণ্ময়ের নিষ্প্রভ মণি পলকের জন্য জ্বলে উঠল। পরক্ষণে স্বাভাবিক। ফোন নম্বরটা আউড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ করে এসে টুপুর বলল, "ভদ্রলোকের উপর তুমি কিন্তু খুব অত্যাচার করলে।"

মিতিন নির্বিকার মুখে বলল, "প্রয়োজন ছিল।"

"যদি কোনও অপরাধ ঘটেও থাকে, এঁকে কি সন্দেহের তালিকায় রাখলে?"

"ফালতু কথা ছাড়," মিতিন উঠে দাঁড়াল, "খেয়ে উঠে বেরোতে হবে।"

॥ ১০ ॥

বাড়িটা গলির ভিতরে। ছোট্ট, কিন্তু দোতলা। বাইরে থেকে জানলা, দরজা আর দোতলার বারান্দার টানা রেলিং দেখে বোঝা যায় তালতলা অঞ্চলের আর পাঁচটা বাড়ির মতো পুরনোও বটে। তবে সম্প্রতি কলি ফেরানো হয়েছে। নতুন রঙের ছোঁয়া পেয়ে বাইরেটা এখন রীতিমত চকচকে। সদর দরজা খোলা। ঢুকতেই বাঁয়ে একটা সাইবার কাফে। ডান দিকে ডাক্তারের চেম্বার। সেখানে কাঠের নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে রণেন সামন্তর নাম।

মিতিন পরদা সরিয়ে উঁকি দিল। অন্দরে একটি মাত্র ছোকরা বসে। মোবাইল নিয়ে কী যেন খুটখাট করছে।

মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "ডাক্তারবাবু নেই?"

ছোকরা মুখ তুলেছে। স্বরে বাড়তি ওজন এনে বলল, "বিশ্রাম নিচ্ছেন। ঠিক ছ'টায় নামবেন। দেখাতে হলে নাম লিখিয়ে যান।"

"একটা অন্য কাজ ছিল," মিতিন নিজের ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিল, "এটা ডাক্তারবাবুকে গিয়ে দিন। উনি বুঝতে পারবেন।"

মোবাইল চর্চায় ব্যাঘাত ঘটায় ছোকরা বেশ বিরক্ত। কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিতিন-টুপুরকে জরিপ করল একবার। তারপর অন্য একটা দরজা দিয়ে গিয়েছে অন্দরে।

রোগীদের জন্য পাতা বেঞ্চিতে বসল মিতিন আর টুপুর। সামনেই খোলা জানলা। গরাদের ওপারে বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা। বেশ কিছু লতানে গাছ গজিয়ে সেখানে। হাল্কা বেগুনি ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। দেখতে বেশ লাগছে।

ছোকরার প্রায় পিছন-পিছন হন্তদন্ত পায়ে রণেন সামন্ত উপস্থিত। অপ্রস্তুত স্বরে মিতিনকে বললেন, "একটা ফোন করে আসবেন তো! তা হলে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বসানো যেত। একা মানুষ বাস করি, উপরটা বড্ড অগোছালো হয়ে থাকে।"

"নো প্রবলেম। এখানেই বসছি।"

"না-না, আমার চেম্বারে আসুন।"

পাশেই একখানা পুঁচকে ঘর। একদিকে রোগী পরীক্ষার লম্বাটে বেড, অন্য দিকে টেবিল-টেয়ার। ডাক্তারের চেয়ারটি গদি-মোড়া। ঘরের কোণে একটি ছোট বেসিনও দৃশ্যমান।

মিতিনরা বসতেই ডাক্তার হাসি-হাসি মুখে বললেন, "হঠাৎ এই অভাজনকে কী দরকার পড়ল ম্যাডাম?"

মিতিন হাসল, "এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম আপনাকে একটা খবর জানিয়ে যাই।"

"কী?"

"মনে হচ্ছে মিস্টার যোশুয়াদের কেসটায় এবার ইতি টানতে হবে।"

"কেন, তদন্ত শেষ?"

"মোটামুটি।"

"কী বুঝলেন?"

"আমার কয়েকটা দিন বৃথাই নষ্ট হল।"

"তিনটে মৃত্যুর কোনওটাতেই কোনও রহস্য খুঁজে পেলেন না?"

"সেরকমই তো দাঁড়াচ্ছে," মিতিন ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বলল, "শুধু একটা ব্যাপারই কেমন খচখচ করছে।"

"কী বলুন তো?"

"তিনটে মৃত্যুর আগে একটা করে মাইনর ইনসিডেন্ট ঘটেছে এবং সেগুলো প্রায় সিমিলার।"

"আপনি কোন ঘটনার কথা বলছেন?"

"মনে করে দেখুন। তিনজনেরই গায়ে মৃত্যুর আগে কোনও না-কোনও খাবার বা ড্রিঙ্কস পড়েছিল। সেই খাদ্য বা পানীয় থেকে যদি এমন কোনও বিষক্রিয়া ঘটে থাকে, যার এফেক্ট সাধারণ পোস্টমর্টেমে ধরা পড়বে না। কমন হার্ট ফেলিওরই দেখাবে।"

"আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম, এরকম একটা আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না," ডাক্তার মিতিনের কথায় সায় দিলেন, "তো এখন আর সে ব্যাপারে তো কিছু করা যাবে না। একমাত্র বডিগুলোকে গোর থেকে তুলে যদি ফের টেস্ট করা যায়, তবে হয়তো...।"

"না-না, ওসব হাঙ্গামা করা আর সম্ভব নয়। তা ছাড়া মিস্টার যোশুয়াও এখন আর কেসটা নিয়ে প্রসিড করতে তেমন আগ্রহী নন।"

"ওমা, তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কাল তো বলছিলেন এবার পাকাপাকি লন্ডনে চলে যাবেন।"

"পুওর সোল। ডেভিড কলকাতাকে খুব ভালবাসত," ডাক্তার ঝুঁকলেন সামান্য, "তা উনি বাড়িটা বিক্রির বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন?"

"করবেন নিশ্চয়ই। আপনার চেনাজানা আছে কেউ?"

"আমি তো একেবারেই অন্য লাইনের লোক। তবে ডেভিড বললে একটু খোঁজখবর করে দেখতে পারি।"

"করাই তো উচিত। আপনি বন্ধুলোক। মিস্টার যোশুয়ার আপনার উপর অগাধ আস্থা," বলতে-বলতে মিতিন থামল একটু। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, "সত্যি বলতে কী, সেই কারণে আপনি আমারও খুব ভরসার পাত্র। তাই আপনার একটু গাইডেন্স চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"তদন্ত তো এবার থেমেই যাবে। তবু একটা সম্ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছে," মিতিনের চোখ সরু, "আচ্ছা, আইসক্রিম কিংবা শরবত যা-ই গায়ে পড়ুক না কেন, তার ট্রেস নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির পোশাকে থাকবে?"

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ। থাকা উচিত।"

"তা হলে তো... মিস্টার আব্রাহাম আর ম্যাডাম ক্যাথলিনের পোশাক এখন আর অবিকৃত অবস্থায় মিলবে না, কিন্তু র‍্যাচেলম্যাডামের ড্রেস তো মজুত। এখনও ধোওয়া-কাচা হয়নি। তাই ভাবছি পোশাকটাকে ফরেনসিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করি," মিতিন কৌতূহলী চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাল, "আইডিয়াটা কেমন?"

"ভাল। ভালই তো। আপনার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। তা কবে পাঠাচ্ছেন ফরেনসিকে?"

"শুভস্য শীঘ্রম। এক্ষুনি বন্দোবস্তটা করে ফেলি," বলেই মোবাইল বের করে মিতিন টকটক নম্বর টিপল। টুপুরকে হতবাক করে অবিকল সকালের বয়ানে মিস্টার যোশুয়াকে পোশাকটি সংরক্ষণের নির্দেশ দিল আবার। বাড়তি শুধু যোগ করল, পোশাকের প্যাকেটটি যেন নিচুতলার ড্রয়িংরুমে রাখা থাকে, পুলিশ কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর ফোন অফ করে স্মিত মুখে বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত। যদি কিছু না পাওয়া যায় আমাদের সকলের মনের ধন্দটা কেটে যাবে, ঠিক কিনা?"

"একদম ঠিক। ডেভিডের মনেও স্বস্তি আসবে। তা উনি অ্যারেঞ্জ

করে রাখছেন তো?"

"এক্ষুনি করবেন বললেন। যতীন নাকি আজ ছুটি নিয়ে তার সোনারপুরের বাড়িতে গিয়েছে। রাত দশটার আগে ফিরবে না। তাই উনি নিজের হাতেই...।"

"ও," ডাক্তার হাসলেন, "তা আপনারা এখন যাবেন কোথায়? বাড়ি?"

"হুঁ, ক'জন গেস্ট আসার কথা," মিতিন কবজি উলটে ঘড়ি দেখল, "ছ'টা তো বাজে। আপনারও তো রোগী দেখার সময় হয়ে এল।"

"আমার প্র্যাকটিসে তেমন আগ্রহ নেই। সকালে ঘন্টা দুয়েক বসলাম, বিকেলে এক ঘন্টা। একা মানুষ তো, এতেই চলে যায়।"

"মিস্টার যোশুয়ার বাড়িতে আপনার প্যাডটা দেখছিলাম। আপনি তো একসময় মিলিটারির ডক্টর ছিলেন, তাই না?"

"প্রায় কুড়ি বছর। গোটা ইন্ডিয়া চষে বেড়িয়েছি। এই তো বছর দুয়েক হল কলকাতায় ফিরেছি।"

"বাড়িটা কি আপনার নিজের?"

"ওই আর কী। হাতে তো কিছু পয়সাকড়ি পেয়েছিলাম, সস্তায় বাড়িটা কিনে নিয়েছি।"

"সাইবার কাফেটা কি ভাড়া দিয়েছেন?"

"দিলাম। যা আসে সেটুকুই লাভ।"

"শেষ একটা কৌতূহল। মিস্টার আব্রাহামের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল কী ভাবে?"

"নাহুমসাহেবের দোকানে যেতাম। সেখানেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব।"

"ও। চলি তা হলে আজ? ফরেনসিক রিপোর্টটা পেলে অবশ্যই আপনাকে জানাব। হোপফুলি কিছু মিলবে না।"

"আমিও সেই আশাই করি।"

বাড়ির দরজা পর্যন্ত মিতিনদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন ডাক্তার। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে গাড়িতে চাপল মিতিন আর টুপুর। মাসির আজকের কাজকর্ম, কথাবার্তা সবই কেমন ধোঁয়াশার মতো লাগছিল টুপুরের। দুপুরে বেরিয়ে আজ সোজা গেল মিস্টার যোশুয়ার বাড়ি। তাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে একটা প্যাকেট নিয়ে এল। সেটা নিয়ে জমাও করে এল লালবাজারে অনিশ্চয় মজুমদারের কাছে। প্যাকেটটাতে কি তা হলে র‍্যাচেলম্যাডামের ড্রেস ছিল না? অন্য আর

কিছু টেস্ট করতে দিয়ে এসেছে? তুৎ, সব জায়গায় টুপুরকে গাড়িতে বসিয়ে রাখলে টুপুর রহস্যখানা ভেদ করবে কী করে?

মিতিন গাড়ি স্টার্ট দিতেই টুপুর প্রশ্ন ছুড়ল, "তোমার উদ্দেশ্যটা কী বলো তো? তুমি তো নিজেই ফরেনসিক টেস্টের প্ল্যান করেছ। আবার ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন?"

মুচকি হেসে মিতিন বলল, "আমি তো আনাড়ি ডিটেকটিভ। একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেব না?"

"কিন্তু দুপুরে লালবাজারে ওই প্যাকেটটা?"

"আহ্, এত বকবক করিস কেন? সকালে যে বললাম, চুপচাপ খেলা দেখে যা!"

অগত্যা মুখে কুলুপ আঁটতেই হয় টুপুরকে। মনে যদিও অজস্র প্রশ্ন বুড়বুড়ি কাটছে। মাসি যখন বাড়ি না গিয়ে মিউজিয়ামের পাশের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করল, তখনও যেন খানিকটা অভিমানেই রা কাড়ল না টুপুর। মার্কুইস স্ট্রিটের দিকে যখন হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল মিতিন, তখনও না।

মিস্টার যোশুয়ার গেট দিয়ে ঢুকেই হঠাৎ যেন মিতিনের ভোল বদলে গিয়েছে। টুপুরের হাত ধরে টানল, "দাঁড়াও, আমরা এখন বাড়ির ভিতরে যাব না।"

টুপুর ভার গলায় বলল, "কেন? আমি সঙ্গে আছি বলে?"

"দূর বোকা। আয় আমার সঙ্গে।"

টুপুরকে টানতে-টানতে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে এল মিতিন। বলল, "একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়।"

"কী করব বসে-বসে?"

"আস্তে-আস্তে এক থেকে দু' হাজার গোন। মনে-মনে।"

মাসির এ কী আজব খেলা? তবে তার নির্দেশ তো অমান্য করার জো নেই, নিঃশব্দে আওড়াচ্ছে সংখ্যা। বিকেলও পড়ে আসছে ক্রমশ।

দেড় হাজার পর্যন্ত গোনা হল না, তার আগেই জোর চমক। ডাক্তারের স্কুটার ঢুকছে! টুপুর বিস্মিত মুখে বলে উঠতে যাচ্ছিল, "এ কী!" মিতিন হাতের ইশারায় তাকে বলল, চুপ।

গাড়িবারান্দার নীচে স্কুটার রেখে ডাক্তার বেল বাজালেন। মিস্টার যোশুয়া এসে দরজা খুললেন। ভিতরে ঢুকে গেলেন ডাক্তার।

আরও মিনিট পাঁচেক পর গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল মিতিন। নিঃসাড়ে। পিছু-পিছু টুপুর।

তখনই কী আজব কান্ড! একখানা প্যাকেট হাতে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসেছেন ডাক্তার! মিতিনকে দেখামাত্র তাঁর মুখখানা ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছে, "আ আ আপনারা?"

"আপনারই প্রতীক্ষায়," মিতিন চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "এত সহজে আপনি ফাঁদে পা দেবেন ভাবতে পারিনি।"

"কী ফাঁদ? কিসের ফাঁদ?"

"ওই প্যাকেটে ম্যাডাম র‍্যাচেলের ড্রেস নেই মিস্টার সামন্ত। এতক্ষণে সেটি ফরেনসিক ল্যাবে পৌঁছে গিয়েছে। তখন আপনার চেম্বার থেকে যে ফোনটা করেছিলাম, সেটা একেবারেই ফল্‌স। অন্য প্রান্তে কেউ ছিল না।"

"ও। তাতে আমার কী?"

"কিছুই যদি না থাকে, প্যাকেটটা চুরি করতে ছুটে এসেছেন কেন?" এক পা, এক পা করে এগিয়ে গেল মিতিন। তীব্র স্বরে বলল, "সরি রণেন সামন্ত, ওরফে ভাগলপুরের জয় মহারাজ, ওরফে পানাজির রবার্ট ডিকস্টা... আপনার জারিজুরি খতম।"

"কী সব আলতু ফালতু নাম বলে যাচ্ছেন? তারা কে?"

"পুলিশের গুঁতো খেলে সব স্মরণে এসে যাবে," দু'জনের চড়া গলার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন ডেভিড যোশুয়া। গোল্লা-গোল্লা চোখে বোঝার চেষ্টা করছেন ব্যাপারটা। মিতিন ঘুরে তাঁকে বলল, "আপনার সন্দেহটা অভ্রান্ত মিস্টার যোশুয়া। আপনার বোন, ভগ্নিপতি এবং স্ত্রী, তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই নৃশংস খুনিটি হলেন আপনার এই পরম বিশ্বাসভাজন বন্ধুবর।"

"যত সব আজেবাজে কথা। আমার ফালতু বুকনি শোনার সময় নেই," বলেই ঝটিতি স্কুটারে চেপেছেন রণেন সামন্ত। অমনি মিতিন পথ রোধ করে দাঁড়াল। কঠোর স্বরে বলল, "ভুলেও পালাবার চেষ্টা করবেন না। তালতলা থানার পুলিশ এ বাড়ি ঘিরে রেখেছে।"

রণেন মরিয়া হয়ে বললেন, "আপনি আমাকে এভাবে হ্যারাস করতে পারেন না। আমি একজন রেসপেক্টেবল ডাক্তার। আপনি আমায় অপমান করছেন।"

"চুপ করুন। আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা যে ভুয়ো, সেটাও আর জানতে বাকি নেই।"

ডেভিড যোশুয়া বিড়বিড় করে বললেন, "ও ডাক্তারই নয়?"

"মোটেই না। জন্মে কোনও দিন মিলিটারিতে চাকরিও করেননি," মিতিন তর্জনী তুলে রণেনকে দেখাল, "আদতে ইনি একজন সিরিয়াল কিলার। অল্প কয়েকজন ধনী বৃদ্ধকে বেছে নিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে তাঁদের খুন করেন। তারপর সেই এলাকা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ভাগলপুরে উনি চারজন বাঙালি বৃদ্ধকে মেরেছেন, পানাজিতে তিন পর্তুগিজ বৃদ্ধাকে। কলকাতায় টার্গেট ছিলেন আপনারা। ইহুদিরা। আপনার খুব কপাল ভাল, আপনি অন্তত বেঁচে গেলেন। যেভাবে উনি বিষপ্রয়োগে একের পর-এক হত্যালীলা চালিয়েছেন।"

"আমি বিষ দিয়েছি? যা খুশি বললেই হল?" রণেন সামন্ত এখনও ফোঁস ফোঁস করছেন, "প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ আপনার বাড়িতেই আছে সামন্তমশাই," মিতিনের ঠোঁট বেঁকে গেল, "আপনার ওই জংলা ফুলের গাছগুলোকে আমি কি চিনতে পারিনি ভেবেছেন? ওগুলো তো স্ট্রোফান্‌থাস। লতানে গাছগুলো মূলত আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়। ভারতেও মেলে অল্পস্বল্প। দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে। ওই ফুলেরই বীজ থেকে তৈরি করা যায় প্রাণঘাতী বিষ আওয়াবেন। যার এক মিলিগ্রামও শরীরের কোষে প্রবেশ করলে এক ঘণ্টারও কম সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, ওই বিষ মগজে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ঢুকতে দেয় না। বিষটা ভারী অদ্ভুত। পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পরে পোস্টমর্টেম হলে বিষের আর কোনও চিহ্নই মেলে না শরীরে। তখন সাধারণ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বলে রায় দেন মর্গের ডাক্তার। কিন্তু ম্যাডাম র‍্যাচেলের পোশাকে তো আওয়াবেনের চিহ্ন মিলবেই। নয় কি মিস্টার সামন্ত?"

"এখনও বলছি, আপনি কিন্তু আমায় মিথ্যে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।"

"দেখা যাক, আপনার বাড়ি তল্লাশি করলে ওই বিষের সন্ধান মেলে কিনা," বলতে- বলতে মোবাইল তুলে একটা ফোন। অবিলম্বে পুলিশ অফিসার ঢুকছেন গেট দিয়ে। রণেনের ঘাড় ঝুলে গেল।

॥ ১১ ॥

রবিবারের সন্ধে। সূর্যাস্তের সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়েছে ইহুদি প্রথামাফিক যোশুয়া পরিবারের প্রথম সাতদিনের শোক পালন। মার্কুইস স্ট্রিটের বাড়িটায় আজ ছোট্ট একটা জমায়েতের আয়োজন করেছেন ডেভিড। পার্থ আর টুপুরকে নিয়ে এসেছে মিতিন। সারা আর বেঞ্জামিনও হাজির। ডেভিডের বিশেষ আমন্ত্রণে পুলিশকর্তা অনিশ্চয় মজুমদারও উপস্থিত। নীচের ড্রয়িংরুমেই সকলে জড়ো হয়েছিলেন, মিতিনের পীড়াপীড়িতে সবাই মিলে উঠে এসেছেন দোতলায়। আব্রাহাম মাটুকের লাইব্রেরিতে। বেঁটে-বেঁটে টুল আনা হয়েছে এ ঘরে, গোল হয়ে বসেছেন সাতজন।

ডেভিডের মুখ-চোখ এখনও মোটেই স্বাভাবিক নয়। রীতিমত মুষড়ে আছেন প্রবীণ মানুষটি। মাত্র ক'দিনে তাঁর কপালের বলিরেখা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। বিমর্ষ স্বরে বললেন, "ডাক্তারই যে অপকর্মগুলো করছে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ম্যাডাম। যাই হোক, রহস্য ভেদ করে অপরাধীকে ধরার জন্যে আপনাকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ তো আমাদের তরফ থেকেও প্রাপ্য," অনিশ্চয় মজুমদারের গমগমে গলা বেজে উঠল, "আপনার দৌলতে কী

জাঁদরেল একখানা ক্রিমিনাল পাকড়ানো গেল, বাপস্! যা যা আপনি বলেছিলেন অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গিয়েছে। তালতলার বাড়িখানা রেড করে আমরা তো স্তম্ভিত। দোতলায় আস্ত একখানা ল্যাবরেটরি বানিয়ে রেখেছিল ওই রণেন সামন্ত! স্ট্রোফানথাস গাছের এক কাঁড়ি শুকনো ফল, তার বীজের গুঁড়ো থেকে বানানো বিষ, ব্যুরেট, পিপেট, টেস্টটিউব, নানান কেমিক্যাল, সব এখন আমাদের জিম্মায়। ওর আর নড়নচড়নের রাস্তা নেই। ফরেনসিক রিপোর্টটা এলেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাবে। তবে...।"

মিতিন ভুরু কুঁচকোল, "কী তবে?"

"লোকটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে ম্যাডাম। রুম সার্চ করে ওর লেখাপড়ার সার্টিফিকেটগুলোও মিলেছে। দুর্ধর্ষ স্টুডেন্ট ছিল এককালে। হায়ার সেকেন্ডারিতে লেটার মার্কস, গ্র্যাজুয়েশনে কেমিস্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস!"

"প্রতিভাবান বলেই তো অমন তুখোড় মগজ। শুধু শর্টকাটে টাকা রোজগারের ফন্দি এঁটে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলল," মিতিনের ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি, "ভাবুন, কেমন মানুষ! বইপত্র ঘেঁটেঘুঁটে এমন একটা বিষ খুঁজে বের করল, রুটিন ময়নাতদন্তে যার সন্ধানই মিলবে না। তারপর একটা-একটা লোককে টার্গেট করছে। বিষ দেওয়ার আইডিয়াটাও কী নিপুণ। গায়ে কোনও পানীয় বা আইসক্রিম গোছের কিছু কায়দা করে ঢেলে দাও, তারপর হইচই জটলার মাঝে নিজের বিষ মাখানো রুমালখানা ধরিয়ে দাও কারও হাতে। মোছার সঙ্গে-সঙ্গে বিষ ঢুকে যাবে শরীরে, তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জীবন শেষ। পানীয় কিংবা আইসক্রিম পরীক্ষা করে কোনও লাভ নেই, তাতে কোনও বিষ মিলবে না। শুধু রুমালটাকে হাপিস করে ফেললেই কেল্লা ফতে, আর কোনও প্রমাণ নেই।"

অনিশ্চয় বললেন, "ভাগ্যিস ড্রেসটা ফরেনসিকে পাঠানোর কথা আপনার মাথায় এসেছিল। অন্য দু'বার তো নর্মাল মৃত্যু ভেবে...।"

"এবারও সেভাবেই চলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু অপরাধের চিহ্ন তো কোথাও না- কোথাও থেকেই যায়, তাই না মজুমদারসাহেব?"

"হুম, ড্রেসটা সরিয়ে ফেলতে পারলে সামন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেত। বুদ্ধিটা সামন্তর মাথায় আসেনি। ভেবেছিল আর দু'বারের মতো এবারও ঘুঘু ধান খেয়ে পালিয়ে যাবে।"

বেঞ্জামিন ধন্দ মাখা মুখে শুনছিলেন কথাগুলো। হঠাৎ মিতিনের দিকে ফিরে বললেন, "ম্যাডাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কি গোড়াতেই বুঝেছিলেন মৃত্যুগুলো অস্বাভাবিক?"

"না," মিতিন ঘাড় নাড়ল, "সন্দেহটা আমার দানা বাঁধে র‍্যাচেল ম্যাডামের মৃতদেহখানা দেখে। ওঁর হাতে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে নীলচে ছোপ ছিল। তা ছাড়া, যত সামান্যই হোক, বডিতে পচন ধরতে শুরু করেছিল। বিষের প্রভাব না থাকলে মৃত্যুর মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে যা হওয়ার কথা নয়। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট দেখে তাই খুব হতাশ হইনি। শুধু নেচার অফ পয়জনটা আমায় ভাবাচ্ছিল। সেটাও তো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে গেল।"

"কীভাবে?"

"এই যে তিন ভিকটিমের গায়ে পানীয় কিংবা আইসক্রিম পড়ার সমাচারটি। বুঝলাম একটি দুর্ঘটনাও কাকতালীয় নয়। পিছনে কোনও ঝানু মাথার প্ল্যান আছে। তখনই আমার নিজস্ব পুরনো ক্রাইম রেকর্ডগুলো ঘাঁটতে লাগলাম। দেখলাম, ভাগলপুর আর গোয়াতেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের একই ধরনের অপমৃত্যু ঘটেছিল। সেখান থেকেই দুয়ে-দুয়ে চার করে-করে এগিয়েছি।"

পার্থ তেরচা চোখে বলল, "তখন অনেকে নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহের তালিকায় ছিলেন? শ্যামচাঁদ অগ্রবাল, প্রোফেসার সেন, হয়তো বা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বেঞ্জামিনও?"

"আজ্ঞে না স্যার। যখনই জানলাম রণেন সামন্ত এ বাড়ির লেটেস্ট আগন্তুক এবং কলকাতার ইহুদি সমাজে তার যথেষ্ট মেলামেশা আছে, তখন থেকে সামন্তই আমার একমাত্র টার্গেট।"

এবার টুপুর আপত্তি জানিয়েছে। বলল, "তা হলে তুমি শ্যামচাঁদ অগ্রবাল আর প্রোফেসার সেনকে অত জেরা করলে কেন? কড়া-কড়া কথা শোনালেই বা কেন?"

"ওরে বোকা, ওঁদের অতীত দুষ্কর্মের কথা বলে হ্যামার না করলে ওঁরা সুড়সুড়িয়ে কি সত্যি কথাগুলো আওড়াতেন? কোন পার্টিতে কী ঘটেছিল নিখুঁত ভাবে স্মরণ করতেন কি? সামন্ত যে সর্বদাই খানিকটা নেপথ্যে থাকছে তাও কি জানা যেত?" মিতিন মিটিমিটি হাসছে, "তা ছাড়া দু'জনকে একটু সমঝানোর দরকারও ছিল। মিস্টার যোশুয়া আর মিস্টার আব্রাহাম মাটুকের বন্ধু হিসেবে ওঁরা আসতেন বটে, কিন্তু কেউই তো খুব সুবিধের লোক নন। শ্যামচাঁদবাবু ছটফট করছিলেন সস্তায় জমি-বাড়িটা কেনার জন্যে। আর প্রোফেসর সেনের লোভ ছিল গুপ্তধনে। যতীনকে এ বাড়িতে ঢোকানোর সেটাই কারণ। যাতে সে সর্বদা এই বাড়ির লোকজনের উপর নজরদারি চালাতে পারে।"

"আর ভুতুড়ে ফোনের ব্যাপারটা? ওটাও কি যতীনকে দিয়ে...?"

"আরে না। যতীন অত সব জটিল কায়দা জানবে কোত্থেকে?" মিতিন ঠোঁট চাপল, "ওটাও রণেন সামন্তর প্যাঁচ।"

"কীরকম?"

"ইন্টারনেট ঘাঁটলে দেখতে পাবি, 'স্পুফ কার্ড' বলে একটা সিস্টেম আছে। ওতে নিজের নম্বর গোপন রেখে যে-কোনও একটা নম্বর লাগিয়ে যত্রতত্র ফোন করা যায়। পুলিশ তো বটেই, আমরা গোয়েন্দারাও অনেক সময় ওই পদ্ধতির আশ্রয় নিই। তাই না অনিশ্চয়দা?"

"ইয়েস," অনিশ্চয় মাথা দোলাচ্ছেন, "মিস্টার যোশুয়া যখন প্রথম কমপ্লেনটা করেছিলেন, তখনই আমার খেয়াল করা উচিত ছিল। কেসটায় তখন তেমন গুরুত্ব দিইনি তো।"

"আমি কিন্তু প্রথমেই ধরেছিলাম," মিতিন হাসছে, "ইন ফ্যাক্ট, আমার ল্যাপটপ থেকে ওই প্রসেসেই তো একটা ফোন করলাম প্রোফেসর সেনকে। মস্ত একটা লাভও হল। প্রোফেসর সেনের ছুটে আসা দেখে পাকাপাকি ভাবে সন্দেহ থেকে ওঁকে বাতিল করা গেল।"

পার্থ চোখ সরু করে বলল, "তা রণেন সামন্তকেও একটা ফোন লাগালে না কেন?"

"খেপেছ? নির্ঘাত বুঝে যেত ওকে ট্যাপ করা হচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান হয়ে উড়ে পালাত। ভাগলপুর বা গোয়ার মতো।"

ডেভিড পাথরের মতো মুখ করে বসে। মিতিনকে ধন্যবাদ জানানোর পর আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। দীর্ঘক্ষণ পর ফের তাঁর স্বর শোনা গেল। মৃদু কণ্ঠে বললেন, "এই শহরে প্রায় না থাকার মতো করে আমরা কয়েক ঘর মাত্র ইহুদি টিকে আছি। তাদের মধ্যে তিন-তিনজন অকারণে প্রাণ হারাল। স্রেফ আমার দোষে। স্রেফ আমার দোষে।"

"কী যা তা বলছ?" বেঞ্জামিন সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "তোমার কী দোষ?"

"ওই যে গুপ্তধনের গল্প ফাঁদা। ভেবে দ্যাখো তারপর থেকেই একজন-একজন করে...।" ডেভিড ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, "অথচ আদৌ হয়তো ওই গুপ্তধনের কোনও অস্তিত্বই নেই!"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না মিস্টার যোশুয়া," মিতিনের স্বর যথেষ্ট দৃঢ়, "যা রটে, তার সবটাই কিন্তু মিথ্যে নয়। মিস্টার আব্রাহাম মাটুকের এই বাড়িতে গুপ্তধন থাকার কিন্তু সমূহ সম্ভাবনা।"

"আপনি কি ঠাট্টা করছেন ম্যাডাম? কোথায় আছে সেই মণিমাণিক্য?"

জবাব না দিয়ে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিতিন। পায়ে-পায়ে গিয়েছে ঘরের মধ্যিখানে। সরু-সরু থাম তিনটের সামনে। মাঝের থামখানা একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করতে-করতে বলল, "এর গায়েই তো আপনাদের আদি ধর্মগ্রন্থ তালমুদ খোদাই করা আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমাদের পবিত্র হিব্রু ভাষায়।"

আস্তে-আস্তে থামটাকে আলগা ভাবে ঠুকল মিতিন। এক জায়গায় থেমেছে আঙুল। সেখানে সামান্য চাড় দিতেই, কী আশ্চর্য, খুলে গিয়েছে থামের ঢাকনা। হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স বের

করে আনল মিতিন। গম্ভীর গলায় বলল, "আগের দিনই পরখ করে গিয়েছিলাম, থামের ওই অংশটুকু ফাঁপা। এবার আপনি দেখুন তো মিস্টার যোশুয়া, কাঠের বাক্সখানাও ফাঁপা কিনা।"

কাঁপা-কাঁপা হাতে বাক্সখানা নিলেন ডেভিড। খুলছেন সন্তর্পণে। ছোট্ট ডালাখানা উন্মোচিত হতেই সাত জোড়া চোখ বিস্ময়ে শিহরিত। পায়রার ডিমের সাইজের অপরূপ এক পাথর শোভা পাচ্ছে আধারে। কী তার দ্যুতি! গা দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে গোলাপি আভা, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

ডেভিড অস্ফুটে বলে উঠলেন, "এ তো সেই চুনি!"

"হ্যাঁ। বদখ্শানি চুনি। কম সে কম দেড়শো ক্যারেট তো হবেই। এর জুড়ি দুনিয়ায় দ্বিতীয় মিলবে কিনা সন্দেহ।"

ডেভিডের দু' হাতের আঁজলায় ঝকমক করছে চুনিটা। নির্নিমেষে দেখছেন ডেভিড। তাঁর দু' চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে অঝোরে।

টুপুরের মনটা ভারী হয়ে এল।

ফেরার পথে স্টিয়ারিংয়ে পার্থ। গাড়ি চালাতে-চালাতে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। তার বেসুরো সঙ্গীতে টুপুরের মনখারাপ উধাও, সেও হেসে উঠছে খিলখিল।

মিন্টো পার্কের মুখটায় এসে মিতিন বলল, "প্রাণে খুব পুলক জেগেছে? মিস্টার যোশুয়ার চেকখানা দেখে খুশিতে একেবারে আত্মহারা?"

"মোটেই না," পার্থ ঠাট্টা ছুড়ল, "আমার মজা লাগছে তোমার ব্যাখ্যান শুনে। যা গুলগাপ্পি মেরে তুমি কেসটা সল্‌ভ করলে।"

"মানে?"

"ওই যে বললে, পুরনো ক্রাইম রেকর্ড দেখেই নাকি তুমি বুঝে গেলে জয় মহারাজ, রবার্ট ডিকস্টা আর রণেন সামন্ত তিনজনই একই ব্যক্তি! এ তো স্রেফ গোঁজামিল। তোমার কাছে তাদের ছবি নেই, তাদের গতিবিধি সম্পর্কে কোনও ইনফরমেশন নেই। শুধু মৃত্যুর ধরনে মিল আছে বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়াটা কি যুক্তিতে মানায়?"

"কোনও তথ্যই হাতে ছিল না ভাবলে কী করে?" মিতিনও পালটা আক্রমণ জুড়েছে, "অত কাঁচা কাজ প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি করে না মশাই। তিন ওস্তাদের মধ্যে একটা কমন ফ্যাক্টর আছে বইকী। আর সেটাই রণেন সামন্তকে চিনিয়ে দেওয়ার মূল সূত্র।"

"কী?"

"জয় মহারাজ উত্তম বংশীবাদক ছিল। রবার্ট ডিকস্টাও তাই। ওই গুণটা তাদের অ্যাসেট, আবার ওই গুণটাই বাঁশিবাজিয়ে রণেনকে চিনিয়ে দেওয়ার একটা বড় ক্লু। বুঝেছ মশাই?"

"অ। তা হলে তো তোমার প্রশংসা করতেই হয়," পার্থ ঠোঁট ছুঁচলো করল, "সেদিক দিয়ে দেখলে তো বলতেই হবে তোমার মগজের পূর্ণ মর্যাদা তুমি পেলে না। মিস্টার যোশুয়া তোমায় ঠকিয়েছেন।"

"যাহ্, কী যে বলো? পঞ্চাশ হাজার টাকা কম নাকি?"

"মিস্টার যোশুয়ার কাছে তো নস্যি। ফোকটে দিদি-জামাইবাবুর বিশাল সম্পত্তি পেয়ে গেলেন। খুনি ছাড়াও তুমি তাঁকে একটা পঞ্চাশ লাখি চুনি খুঁজে দিলে। বিনিময়ে এক লাখও তো মিলল না। সাধে কি প্রবাদ আছে, ইহুদিরা হাড়কিপটে হয়!" পার্থ হ্যা হ্যা হেসে উঠল। রগুড়ে সুরে বলল, "সামন্তই ওর যোগ্য ওষুধ। টেলিফোনে ভয় দেখাত, বেশ করত।"

পার্থর কথায় হঠাৎই একটা প্রশ্ন জেগেছে টুপুরের মনে। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, রণেন সামন্ত ভয় দেখানো ফোনটা করত কেন? চুপিসাড়ে সকলকে একের পর-এক নিকেশ করে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল।"

"লোকটা ওভার কনফিডেন্ট এবং ওস্তাদ খেলুড়ে। এক ঢিলে দু'টো পাখি মারতে চেয়েছিল।"

"কীরকম? কীরকম?"

"প্রথমত, মিস্টার যোশুয়া ফোনটা পেয়ে সকলকে জানাবেন, কিন্তু ফোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে না পারার দরুন তাঁর কথাকে কেউ আর আমলই দেবে না। মৃত্যুগুলোকে খুন-খুন বলে চেঁচালেও না। ভাববে বুড়ো মানুষটা ভুলভাল বকছে। জানত, সাধারণ পোস্টমর্টেমে বিষটা ধরা পড়বে না, তাই আব্রাহামের ময়নাতদন্তটা করিয়ে দিয়েছিল। অতএব ক্যাথলিনের ক্ষেত্রে তেমন আর জোরাজুরিও করতে পারেননি মিস্টার যোশুয়া। আমি পিকচারে না এলে র‍্যাচেলম্যাডামের মৃত্যুটাও নির্ঘাত চাপা পড়ে যেত। সেকেন্ড কারণ, মৃত্যু আর ফোন, ফোন আর মৃত্যু, এতেই ভয়ে আধমরা হয়ে যাবেন ডেভিডসাহেব। সেই সুযোগে রণেন সামন্ত ইহুদি বৃদ্ধটির আরও কাছের লোক হয়ে উঠবে। সময় বুঝে তাঁকে মারার আগে জমি-বাড়ি বিক্রির জন্য মোক্ষম চাপ দেবে। আমার স্থির বিশ্বাস, প্রোমোটার ওর ফিট করাই ছিল। তার কাছ থেকেও সম্ভবত টাকা খেয়েছে। পুলিশের জেরায় এবার সেটাও প্রকাশ হবে।"

"তৃতীয় একটা উদ্দেশ্যও ছিল," পার্থ শিস দিচ্ছে। চোখ নাচিয়ে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো কী?"

"বুঝতে পারছি না।"

"তোর মাসিকে পঞ্চাশ হাজার পাইয়ে দেওয়া। যাতে আমরা এই চিটপিটে গরমে এক্ষুনি হুস করে একবার দার্জিলিং বেড়িয়ে আসতে পারি," পার্থ চোখ টিপল, "কী রে, যাবি তো?"

টুপুর খুশিতে বাক্যহারা। নিস্তরঙ্গ গ্রীষ্মের ছুটিটা যে শেষমেশ এভাবে জমে উঠবে, কে জানত!

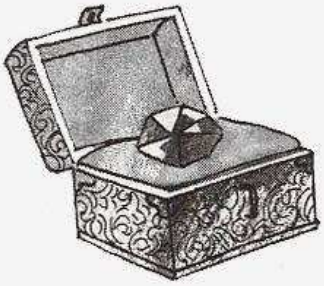

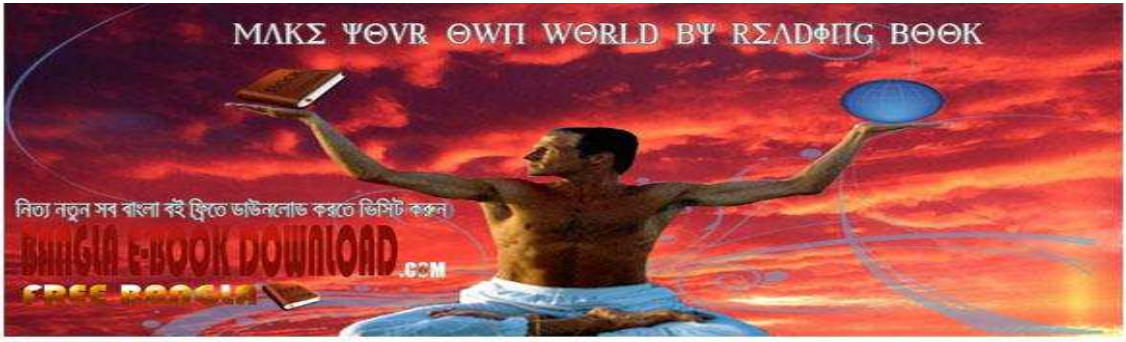

FOR MORE BANGLA EBOOKS

VISIT

www.BanglaEbookDownload.com